S. I. E, W. B.

নন্দিতা

অলকা মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

উৎসর্গ

আমার বই উৎসর্গ করলাম তাদের নামে,
সমস্ত জীবনটাই যাদের উৎসর্গ,
যারা,
মাধুরীর মতন মা…
যারা,
মানবীর মতন স্ত্রী…
যারা,
মঞ্জুর মতন বোন…

তোমাদেরই
"শ্রী"

আমার কথা……

গল্পটি আমার নিজের নয়, ধার করা। ঘটনার ধারায় নিজের পরিকল্পনার পোষাক পরিয়ে 'আমাদের' করে গড়েছি মাত্র। চরিত্রগুলিও আমার কল্পপ্রসূত নয়, বাস্তব জীবনে এদের সঙ্গে কারণে অকারণে ধাক্কাধাক্কি করে, হয় নিজেকে আরোপ করেছি আর নয় আরোপ করাতে বাধ্য করেছি। তবু, এঁরা আমার যেমন অতি, অথবা অল্প পরিচিত, তেমনি অন্য অনেকেই এঁদের হয়ত' জীবনের বাস্তব আলোয় দেখেছেন। আমার ভাষায় এঁদের কতটা প্রকাশ করতে পেরেছি সে বিচারের ভার, যাঁরা বইখানাকে পাতা উল্টে দেখবেন তাঁদের। কায়ার অনুকরণে গড়েছি; যদি ছায়ামাত্র মিল থাকে তাহ'লেই যথেষ্ট। মোট কথা, গরমিলটুকু বাদ দিয়ে মিলটুকুই যেন পাঠক দেখেন এইটুকুই আমার কামনা।

—লেখিকা—

তুমি,

যে-আমাকে-ভার-দিয়েছ,
তোমার বই-এর ভূমিকা লিখতে···
আমার ইচ্ছা ছিল সেই তোমাকেই প্রকাশ করি···
কিন্তু তুমি চাও, তোমার লেখার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে···
আজ শুধু তাই প্রার্থনা করি,
সেই আড়ালই যেন একদিন সব চেয়ে বেশী তোমাকেই প্রচার করে···

আজ চারিদিকের ভাঙা-গড়ার মধ্যে,
মানুষ সব জিনিসকে নিচ্ছে নতুন করে যাচাই করে···
তোমার অভিজ্ঞতায় এক বহু পুরাতন সমস্যাকে
তুমি নতুন মূল্য দিয়েছ···
হয়ত তা নতুন নয়···
হয়ত তাই শাশ্বত···
কিন্তু মানুষের এমনি দুর্ভাগ্য যে,
চির পুরাতনকেও নতুনের ছদ্মবেশে আসতে হয়···

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নন্দিতা

১

শীতকাল।

ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি। চারিদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। দুহাত দূরের মানুষ ভাল করে চেনা যায় না।

অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে আসছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

দূর থেকে দেখা যায় একসারি কয়েকটা আলোক-কণা কুয়াসার বুকে দুলছে। অন্ধকারে জলের ওপর যেন তারার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব। স্পষ্টতা অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

কান পেতে শোনা যায় একটা ঘর্ঘর শব্দ, অশীতিতম বৃদ্ধের কান্নার মতন মর্মন্তুদ। তেমনি চাপা। তেমনি অস্পষ্ট।—মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মুমূর্ষু রুগীর শেষ আর্তনাদের মতন বিষাদমাখা।

তারই একটি থার্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। ময়লা। জীর্ণ।

বড় বড় হরফে লেখা আছে "কুড়িজন বসিবেক"—বসে আছে পঞ্চাশ জন। তিনজন কোণে দাঁড়িয়ে।

এক কোণে বড় বড় হরফে লেখা "থুতু ফেলিবেন না"। তারই ঠিক তলায় এক অস্থিচর্মসার, ক্ষয়রোগ গ্রস্ত মদ্রদেশীয় বৃদ্ধ। বার বার থুতু ফেলছে; শুধু রক্ত।

'চোর' 'পকেটমার' সম্বন্ধে রেল কোম্পানী আগেই সাবধান করে দিয়েছে, পাশের লোকটিকে পর্য্যন্ত সন্দেহ করতে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী মানেই 'চোর' 'বদমায়েস' 'পকেটমার'! শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতবাসী। এদিক দিয়ে আর কোন কথা বলা চলে না; বলবার অধিকার নেই। রাজদ্রোহ।

কেউ জেগে, কেউ আধ ঘুমন্ত, কেউ ঘুমের অভিনয় ক'রে বাস্তবের সুখ অনুভব করছে। কেউ অপলক নেত্রে চেয়ে আছে সামনের যাত্রীর দিকে। সে তখন হয়ত শান্ত নিদ্রায় পৃথিবীর জনতার বহু উর্দ্ধে। সবাই নির্জীব নিঃসাড় পাথরের মত নিস্তব্ধ। এত ভীড় তবু কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এত ঠেলাঠেলি, কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। এত কষ্ট কিন্তু কোন গা নেই, কোন অভাব নেই, কোন অনুযোগ নেই। সবাই যেন প্রাণহীন; মৃত; হঠাৎ দেখলে মনে সন্দেহ হয়; এরা কি মানুষ, না পশু, না নির্বিকার দেবতা ?···

আর এক কোণে।

একটি যুবতী। সম্পূর্ণ জাগ্রতা। দেখতে সুন্দরী: মুখে অবসাদ; ক্লান্তি; গভীর বেদনার ছাপ। চোখের কোণে এককোঁটা জল জমা হয়ে আছে; গড়িয়ে ফেলবার মতো দুর্ব্বলতা তার নেই। খুব রোগা নয় বরঞ্চ প্রথম দর্শনে মোটা বলেই সন্দেহ হয়। তা নয়, সাধারণ চেহারা, দৈর্ঘ্যে একটু ছোট বলে প্রস্থে দেখায় বেশী!

পরণে শাদাসিদে শাড়ি, ফিকে নীলাভ। ময়লা হ'য়ে গেছে পথের ধূলায়। সুশ্রী: রূপের গর্ব নেই: নিজেকে অযথা সুন্দরী ক'রে তোলবার প্রয়াস নেই—সে রুচিও নেই। শিক্ষিতা; কিন্তু শিক্ষার দম্ভ নেই: আধুনিক ভদ্রমহিলাদের মত অভদ্র নয়। তার পাশেই আর একটি মহিলা, বিবাহিতা: কোলে তার বছর খানেকের একটি শিশু: সুন্দর: সরল: মহিলাটি গভীর নিদ্রামগ্ন। ও-কোণে তাঁর স্বামী; তিনিও নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছেন। মাথাটি তাঁর সতরঞ্চি বাঁধা বিছানার ওপর; পা দুটি জানালা দিয়ে বাইরে প্রসারিত।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ছোট্ট শিশুটি ঝুঁকে পড়ে যুবতীটির দিকে। নরম তুলতুলে তার গালটি ওর গালের ওপর এসে পড়ে: ঠাণ্ডা: নরম: যেন একরাশ তুলো।

মেয়েটির ভারি ভাল লাগে। সমস্ত অনুভূতিতে যেন কি অপূর্ব্ব এক তৃপ্তি: এত' সুন্দর, এত' স্নিগ্ধ। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন এক স্বর্গীয় আলোড়নে দুলে ওঠে। মাতৃহৃদয়ের চিরন্তনী দুর্বলতা। মেয়েটি সচকিত হ'য়ে শিশুকে আবার সোজা করে দেয়। শিশুটি হেসে ওঠে খিল্ খিল্ করে। দৃষ্টি কিন্তু তার যুবতীটির দিকে। বড় বড় চোখ দুটিতে আনন্দ

যেন উবছে পড়ছে। সমস্ত ছাপিয়ে উঠেছে অব্যক্ত কৌতূহল : যেন মস্ত বড় দুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

আবার কিছুক্ষণ বিরাম। অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বাইরে একটানা ট্রেনের আর্তনাদ। আবার ঝাঁকুনি, আবার সোজা করে দেওয়া, আবার হাসি। চিন্তার ধারা এমনি করে বার বার তার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে : অন্য সময় হ'লে হয়ত সে রাগ করত' কিন্তু আজ পারল না। এত দুঃখেও তার হাসি এল'। এবার সেও শিশুর সঙ্গে হেসে উঠল—তেমনি সরল হাসি : তেমনি স্নিগ্ধ। নারীর চিরন্তন মাতৃত্ব আজ প্রদীপ্ত। বাইরে কুয়াসার ঘন অন্ধকার, কালো পর্দার মতন। সার্সিগুলো নামান আছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়লে দেখা যায় আর একটা কম্পার্টমেণ্ট। এটারই প্রতিবিম্ব।

জংসন স্টেষণ।

ভোর হ'য়েছে। অন্ধকারের কাল আবরণ ছিন্ন করেছে পূবের একটুখানি আলো। আকাশ মেঘলা। চারটে প্লাটফর্ম নিয়ে একটি স্টেষন। বদলি ক'রে ছোট লাইনে উঠতে হয়। লোক ওঠানামা করে কম।

ট্রেন এসে থামল। যুবতী শেষবারের মতন শিশুটিকে সোজা করে দিয়ে ছোট ব্যাগটি নিয়ে নেমে এল। তুলবার প্রয়োজন ছিলনা, তার মা জেগে গেছে, কিন্তু তবু, শেষবারের মতন তার স্নিগ্ধ পরশ, তার সরল হাসি! ট্রেন থামে মাত্র দুমিনিট। লোক নামল মাত্র দুজন। কুলির হাঙ্গামা নেই, দর কষাকষি নেই, চেঁচামেচি নেই। জায়গায় জায়গায় দুটো করে কুলী শুয়ে আছে, গায়ে তাদের চাদর। শীতের কাঁপুনি সহ্য করতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছে শরীরের উত্তাপের।

গ্যাসের আলো জল্‌ছে মিট্ মিট্ করে। একটা লোক আপাদ মস্তক চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল : তন্দ্রাচ্ছন্ন। ট্রেন ছাড়বার হুইসিলে চম্‌কে উঠল। ট্রেনটি আবার ছুটে চলে গেল তার অনাদিকালের যাত্রা পথে।

ষ্টলে ছেলেটা আগুনে হাত গরম করছিল। আগুনে কেট্‌লি চড়ান, জল ফুটছে।

যুবতীকে অপেক্ষা করতে হবে আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন

ষ্টলের পাশের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। বেঞ্চের পাশে কাল কুকুরটা কুঁকড়ে শুয়েছিল যেন একতাল কাদা। উঠে চলে গেল ওধারে প্লাটফর্মের দিকে।

ছেলেটি বল্লে "চা দেব? জল গরমই আছে।"

মেয়েটি মনে মনে হিসেব করে নিলে, তারপর কি ভেবে বল্লে "আচ্ছা দাও, একটা বিস্কুটও।"

রাত দশটায় হুড়োহুড়ি করে ট্রেন ধরতে হয়েছিল, খাওয়া হয়নি।

"আগুনের ধারে এসে বসুন, বড্ড, ঠাণ্ডা ঐ বেঞ্চিটা!" বলে ছেলেটি টিনের চেয়ারটা এগিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েটির যেন আর নড়ে বসবার ক্ষমতা নেই। অসম্ভব। দু চোখে ক্লান্তির আভাষ পরিস্ফুট।

কুকুরটা আবার ইতিমধ্যে পেয়ালার শব্দ শুনে ছুটে এসেছে। দূরের কুলিটা কেসে উঠল খক্, খক্, খক্।......

ক্রমেই ফর্সা হয়ে আসছে। পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। শীতটাও যেন বেশ জমে উঠছে। এবার তার মরণ কামড়ের সময়। মেয়েটি হাত দুটো এগিয়ে দিল আগুনের দিকে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালার টুং টুং শব্দ। ছেলেটা দুকাপ চা করছে, এই ফাঁকে সে নিজেও এক কাপ খেয়ে নেবে।

আগুনের তাপে মেয়েটির মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। যেন অস্তগামী সূর্য্যের শেষ শিখায় প্রজ্জলিত।

দূর থেকে ভেসে এল ভারী জুতো পরে চলার সগর্ব শব্দ—খট্, খট্, খট্। মেয়েটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিজের চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ভারী জুতো পরা লোকটি অদূরে এসে থামল। মাথায় তার ফেল্ট হ্যাট। গায়ে ওভার কোট, কলার দুটি তোলা। পরণে স্যুট, পায়ে দামী জুতো।

গ্যাসের আলোয় তিনি দাঁড়ালেন। সিগারটা মুখে ধরে দেশলাই জ্বাললেন। মুঠোর মধ্যে দেশলাইর আলোটা নিয়ে মুখের দিকে হাত বাড়ালেন। ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ করলেন।......

মেয়েটি কৌতূহল বশে চেয়ে দেখল। প্রকাণ্ড চেহারাটি তার খুব চেনা। ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী। লম্বায় প্রায় ছফুট, পুরুষোচিত চেহারা সুগঠিত দেহ। নামকরা ডাক্তার। মস্ত পণ্ডিত, রাসায়নিক গবেষণাতেও

জগত জোড়া নাম। দেশালইর অনুজ্জ্বল আলোতে তিনি যেন আরও সুন্দর, আরও সৌম্য। মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠল। ব্যাগটি তুলে নিল। চারটে পয়সা দিল ছেলেটাকে। চা খাওয়া হল না। চা থেকে তখনও গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এক কণা হাসি ঝরে পড়ল তার অজান্তেই।

ডাঃ চৌধুরী মেয়েটিকে দেখেছেন। তিনি এগিয়ে এলেন বললেন "নন্দিতা বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি ?—নন্দিতা মেয়েটির নাম। মাথা নেড়ে নন্দিতা জানালো—"হ্যাঁ।"

আবার বিষাদের কালো ছায়া নন্দিতার মুখে নেমে এল। বেদনার শত ভারে নন্দিতা ভারাক্রান্ত। অসহ্য, তুর্দমনীয়। কান্নার বেগ হৃদয় থেকে উঠে এল! নন্দিতার ঠোঁট তুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তু ফোঁটা জল।

ডাঃ চৌধুরী তখন অন্যমনস্ক হয়ে শূন্যে চেয়ে কি যেন ভাবছেন, কি যেন দেখছেন।

ট্রেন আসার ঘণ্টা পড়ল।

সচকিত হয়ে ডাঃ চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আমিও ল্যাবরেটারিতে তোমার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। ফিরছ ?"

আবার মাথা নেড়ে নন্দিতা জানালো "হ্যাঁ!"

—"বেশ, বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" তারপর আপন মনেই তিনি বলে চলেন, "একলা ট্রেন জার্নি আমার মোটেই ভাল লাগে না, বিরক্ত লাগে, ভয় করে।"

নন্দিতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ। নিজেকে সামলে নিয়েছে ; উদ্ধত কান্নার স্রোত পথ হারিয়ে ফেলেছে। "ভয় করে ?"—

ছেলে মানুষের মত বৈজ্ঞানিক উত্তর দিল "হ্যাঁ, কত কি ঘটতে পারে! কোন তুর্ঘটনা কিম্বা আর কিছু।" একটু থেমে আবার বলেন, "যা হক একটা কিছু ঘটলেই হ'ল।…তোমার বাবা কেমন আছেন ? বাড়ী গিয়েছিলে নিশ্চয় ?"

নন্দিতা আবার বলে "হ্যাঁ!—আর কিছু সে বলতে পারে না। চাপা কান্নার একটা রোল তার গলায় জমা হয়ে আছে। ঠোঁট না চেপে রাখলে, এখুনি বেরিয়ে আসবে।

ও প্লাটফর্মে ট্রেন এসে পড়েছে। এখুনি ছেড়ে যাবে। ডাঃ চৌধুরী বললেন "চল নন্দিতা, ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। আজ বেশী ভীড় নেই!" ডাঃ চৌধুরী চলতে আরম্ভ করলেন।

নন্দিতা পা বাড়াল। একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছে। অজানা একটা আকর্ষণ।

ওভার ব্রিজ পেরিয়ে প্লাটফর্ম। ডাঃ চৌধুরী দাঁড়ালেন একটি সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনে।

নন্দিতা সলজ্জভাবে বললে; "আমি ত আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী।"

নন্দিতা মাথা নিচু কর্‌লে। ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গী হতে পারল না বলে, না লজ্জায়?

ডাক্তার চৌধুরী বললেন "থার্ডক্লাস! রাবিস্‌। কেন?"

নন্দিতা নিরুত্তর।

তিনি ব্যাপারটা বুঝলেন, নিজেই বললেন "ওঃ টাকা কম বুঝি?"—

"হ্যাঁ!"

ডাক্তার চৌধুরী নিজের ব্যাগটি, স্যুটকেশটি আর ছোট্ট বিছানাটি কামরার মধ্যে তুলতে তুলতে বললেন "তাতে কিছু যায় আসে না। এবার তোমার বাবাকে বলে তোমার হাত খরচ কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে।"

নন্দিতা নিরুত্তর। ইঞ্জিনটা ধোঁয়া ছাড়ছে। সামনে সিগনালটা হেলে পড়েছে। যাত্রীদের ওঠানামা নেই। স্টেষণে মাত্র তারা দুজন। পেছনে গার্ড কথা বলছে কোন এক রেল কর্ম্মচারীর সঙ্গে। এক হাতে তার হুইসিল, অন্য হাতে আলো। আলোর প্রয়োজন এখনও শেষ হয়নি। সামনে ঘন অন্ধকার। নন্দিতার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা অশ্রু। তার পর দুটি। তারপর অনেক···"বাবা মারা গেছেন!"

ডাক্তার চৌধুরী চমকে উঠলেন। সামনের ট্রেনটা যেন ঘুরতে আরম্ভ করল। ডক্টর রামকৃষ্ণ রায় এত বড় বিদ্বান লোকটি আর নেই। সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়া যার নাম—সে আজ আর নেই—আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। নন্দিতা! নন্দিতা। সে আজ একা! পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই! নন্দিতা তখন কাঁদছে। অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে একটির পর একটি। কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নেই।

ডাক্তার চৌধুরী নিজের মনেই যেন বলতে আরম্ভ করলেন "তোমার বাবা—তোমার বাবা—ও তাই বুঝি বাড়ী গিয়েছিলে। হবে হয়ত, অনেক দিন কাগজ পড়িনি।" আর কিছু বলবার নেই।

আবার অফুরন্ত নিস্তব্ধতা। দুজনে নির্বাক। নন্দিতা ছেলেমানুষের মতন কাঁদছে। ডাক্তার চৌধুরী স্তম্ভিত। তিনি জীবনের এই সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছরে অনেক রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি। ক্লান্ত মুমূর্ষ রুগীকে উপলক্ষ করে মৃত্যুর সঙ্গে অনেকবার হয়েছে তাঁর মল্ল যুদ্ধ। কখনও মৃত্যু পথযাত্রী উঠে বসেছে। তিনি জিতেছেন। কখনও সে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃত্যু জিতেছে। তাঁর সামনে বিধবা তার একমাত্র পুত্রকে সঁপে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে। বৃদ্ধ পিতা একমাত্র পুত্রকে তুলে দিয়েছে মৃত্যুর হাতে। জয়ের পৈশাচিক হাসি হেসে মৃত্যু সগর্ব্বে চলে গেছে। তিনি কিছু বলতে পারেন নি, কিছু করতে পারেন নি। প্রত্যেকবার তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। শোকে নয়, দুঃখে নয়, অভিমানে নয়। এ সবের বহু উর্দ্ধে তাঁর অনুভূতি। কিন্তু আজ তিনি পরাজিত। স্পষ্ট শুনতে পেলেন অনাদি অনন্তকালের মৃত্যু দেবতা যেন পৈশাচিক ভাবে হাসছে। কিন্তু কেন? কেন তাঁর এ দুর্ব্বলতা? নন্দিতা তাঁর ছাত্রী। এমন কত ছাত্রীইতো তাঁর এসেছে আবার চলে গেছে। দূরে বহুদূরে। আজ সকলকে তাঁর ভাল করে মনেও পড়ে না।

গার্ড হুইসিল দিয়ে সবুজ আলোখানা নাড়ল।

নন্দিতা বল্লে "আপনি উঠে বসুন, এখুনি ছেড়ে দেবে!"

—"তুমিও আমার সঙ্গে যাবে!"

—"কিন্তু আমার।"

—"তোমার টিকিট আমার কাছে আছে। তোমাকে ত আর একলা ফেলে আমি যেতে পারব না। ওঠ! সময় নেই।"

নন্দিতা কোন আপত্তি ক'রল না। নীরবে উঠে বসল। গাড়ী নড়ে উঠল। আবার আরম্ভ হ'ল তার অফুরন্ত যাত্রা। পৃথিবী যেন চীৎকার করে উঠল বুকফাটা আর্ত্তনাদে। নিস্ফল ক্রন্দন। গাড়ী ছুটে চলল তার গন্তব্যের পানে। গতি তার অসীম।

ট্রেনটি ছুটে চলেছে যেন বিরাট অন্ধকার দৈত্য।

কম্পার্টমেন্টে তারা দুজন। প্রশান্ত আর নন্দিতা।

বাইরে শীতের কন্‌কনে বাতাস। আধো আলো—আধো অন্ধকার।

নিস্তব্ধ। নীরব! নিঝুম।

ডাঃ চৌধুরী ভাবছেন "মৃত্যুর এ কি পরিহাস!"

নন্দিতা ভাবছে নিয়তির এ কি গতি!"

এক দম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস তাঁদের দুজনকে কাঁপিয়ে দিল।

ডাক্তার চৌধুরী বললেন "নন্দিতা, পা টা ওপরে তুলে এই কম্বলটা চাপা দিয়ে বোস; আজ ভয়ানক ঠাণ্ডা।"

নন্দিতা ঠিক হয়ে বসল। যেন কলের পুতুল।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

ট্রেন ছুটে চলেছে। অবিরাম। অবিশ্রান্ত।

নন্দিতার চোখে দুফোঁটা জল। দৃষ্টি তার ঝাপ্‌সা। ডাক্তার চৌধুরীর দিকে চেয়ে দেখল সেখানে যেন তিনি নেই। ক্রমেই সে শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি যেন অনেক, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। তাঁর জায়গায় ভেসে উঠল এক নারীমূর্ত্তি। উগ্র আধুনিকা। পালিশ করা। জর্জিয়েট শাড়ী পরা, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। দৃষ্টিতে তার দম্ভ। চালে, চলনে গর্ব। সমস্ত মিলিয়ে যেন একটা জমাট বাঁধা পাশ্চাত্য অসভ্যতা। কুৎসিত।

এ মূর্ত্তি কণিকার। ডাক্তার চৌধুরীর এম, এ পাশ করা আধুনিকা স্ত্রী। ডাক্তার চৌধুরী তখন সিগার মুখে দিয়ে চেয়ে ছিলেন বাইরের দিকে।

নন্দিতা চোখ বুজল। দুফোঁটা জল ধীরে ধীরে নেমে এল। থেমে থেমে। নাকের পাশটিতে জমা হয়ে রইল, যেন দুটি মুক্ত।

ডাক্তার চৌধুরী চাইলেন তার দিকে। এক দৃষ্টে। দৃষ্টি তাকে ভেদ করে ছুটে চলে গেল। বহুদূরে। কলকাতায়।

এক ঝক্‌ঝকে নারী মূর্ত্তি। পৈশাচিক। অসভ্যতার প্রতিমূর্ত্তি। নিষ্ঠুর। সে কণিকা। বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী। ডাক্তার প্রশান্ত চৌধুরীর কেউ নয়। শুধু নামটা তার ব্যবহার হয় ট্রেডমার্ক হিসেবে!

ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে কমে গেল। এক ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

অবিরত অবিশ্রান্ত ছুটে চলার মাঝে ক্ষণিকের জন্য বিরতি।

একটা ছোট স্টেষন।

দুজনেই চমকে উঠল। দুজনেই দেখল নিজেদের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দুজনার চোখে।

দরজা খুলে উঠে এল চেকার।

ডাক্তার চৌধুরী পকেট থেকে বের করলেন দুখানা টিকিট। চেকার পাঞ্চ করে নেমে গেল।

ছেলেমানুষের মতন তিনি বললেন "তোমায় ত বলেছিলুম টিকিট আমার কাছে আছে। কণিকার টিকিট। সে এল না, কলকাতায় রয়ে গেল। পরে আসবে।"

চোখ দুটো তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল।

ট্রেন আবার ছুটে চলেছে, অসীমের পানে। অনিরুদ্ধ গতিতে। ডাক্তার চৌধুরী বললেন "কৈ, তোমার বাবার কথা ত' কিছু বল্লে না।"

—"বলবার কিছু নেই।" নন্দিতা বলে চলে "সময় সময় মানুষের বিপদ এমন তাড়াতাড়ি অথচ সুনিশ্চিত ভাবে এসে পড়ে যে সামলে উঠবার সময় পাওয়া যায় না। আমি এখনও পারিনি। বাবা মারা গেছেন। তার বেশী আর আমি কিছু জানি না।

"কি হয়েছিল তাঁর ?"—

দীর্ঘ নিশ্বাস। অবসাদ। ক্লান্তি। চাপা কান্নার মূর্চ্ছনা।

নন্দিতা বলে "নিউমোনিয়া। শনিবার টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখি জ্বর। কিন্তু সামান্য। আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। ছেলেমানুষের মতন কাঁদলেন। হাসলেন। আমায় সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর চিরকালকার বাসনা, আমায় বৈজ্ঞানিক করার কথা আবার বললেন।

নন্দিতা চুপ করল। গলায় একটা ব্যথা। কান্নার ঢেউ যেন একটির পর একটি আছড়ে পড়ছে। কিন্তু নন্দিতা আর কাঁদবে না। আবার বলে—চলে।

"হঠাৎ থেমে গেলেন। কানে হয়ত ভেসে এসেছিল মৃত্যুর ধীর পদ শব্দ। চীৎকার করে বলে উঠলেন আমি বাঁচতে চাই। তারপর ধীরে ধীরে যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। মুখখানা তাঁর হেলে পড়ল বালিসের পাশে মার ফটোটার ওপর। তারপর সব শেষ। নন্দিতা আর পারলে না। কান্না যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে। কম্বলটি মুঠোর মধ্যে সে চেপে ধরলে। ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরলে। কিন্তু চোখ মানলোনা কোন বাধা। একটির পর একটি গড়িয়ে পড়ল অশ্রুবিন্দু।

নন্দিতা আবার বলে চললো "আমিও যেন কি রকম হয়ে পড়লাম কাউকে কখনও মারা যেতে দেখিনি কিনা। মা যখন মারা যান, তখন আমি খুব ছোট। আমার যেন এখনও মনে হচ্ছে—তিনি আছেন—তিনি ঘুমিয়ে আছেন। জীবন অমর!"—

নন্দিতা চুপ করল। ডাঃ চৌধুরী বলে চল্লেন তার থেমে যাওয়া কথার রেশ টেনে "হ্যাঁ, নন্দিতা ঠিক তাই—তাই তো। জীবনের মৃত্যু হয় না। সে চিরকাল বেঁচে থাকে। নব নব রূপে সে দেখা দেয়। আকাশের মতন সে অনন্ত।

তোমার বাবাকে ত আমরা হারাইনি। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর গবেষণাগারের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিত্ব বেঁচে থাকবে তোমার মধ্যে। তোমার শিক্ষার মধ্যে। তোমার দীক্ষার মধ্যে।"

হঠাৎ তিনি নেমে এলেন বাস্তবতার মধ্যে। পার্থিব জগতে। বল্লেন, "তোমার লেখাপড়ার কি হবে—মানে, তাঁর মৃত্যুতে তোমার আর্থিক অবস্থা কি খুব খারাপ হয়েছে?"

—"হলেও সমস্ত ব্যবস্থা আমি করেছি। বাবার সম্পত্তি সমস্ত দান করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের জন্যে। আমার জন্যে যা ছিল, মামারা তা ভাগ করে নিয়েছেন। মার গয়না বিক্রী করে পেয়েছি দুহাজার টাকা। তাতেই আমার দুবছর কেটে যাবে। আমার পড়া আমি শেষ করব। বাবার অন্তিম ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব।

ডাক্তার চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন "ঠিক।"

নন্দিতা বলে "তাই নয় কি?"

—"হ্যাঁ তাইত! তাই তো ঠিক। জীবনের পথে উচ্চাশার প্রয়োজন আছে বই কি। তবে তোমাদের মতন মেয়েদের বেশী দরকার জীবনের প্রলোভনের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া।"

এরপর আর কিছু বলা যায় না। নন্দিতা নির্ব্বাক। ডাক্তার চৌধুরী নিজেকে হারিয়ে ফেললেন চিন্তায়। "জীবনের প্রলোভন।" কণিকা কি পেরেছে তাকে এড়াতে? স্বামী পেয়েছে। ভালবাসা পেয়েছে। সংসারে শান্তি পেয়েছে। সমাজে গর্বভরে পরিচয় দেবার মতন ট্রেডমার্ক পেয়েছে। নারীর যা কিছু কাম্য, যা কিছু প্রাপ্য সবই সে পেয়েছে। কিন্তু তবু কি সে স্থির হয়েছে? মরীচিকার মতন সে কি ছুটে যায়নি? ভাল-

বাসার সন্ধানে সে কি পুরুষের পর পুরুষের পেছনে ছুটে যায় নি? কি তার লক্ষ্য? কোথায় তার গন্তব্য? কেন এ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা? কিসের 'পরে তার অভিমান? কিসের তার অভাব? একি তার নেশা? না নারীর চিরন্তন স্বভাব?

ডাক্তার চৌধুরী বলেন "তুমি তাহলে এবার সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

একি করুণাসিক্ত সমবেদনা না সন্দেহের বিকাশ?

—"হ্যাঁ থেমে আবার বলে "হ্যাঁ, সম্পূর্ণ একা।"

—"তুমি তোমার বাবাকে ভয়ানক ভালবাস্‌তে না?"

—"তিনি ছাড়া আমার আর কেউ ছিলেন না—আমি এখন একা, পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।"

আবার অশ্রুর ধারা। কান্না। কান্না। কান্না।

সমবেদনার কণ্ঠে ডাক্তার চৌধুরী বলেন, "ছিঃ নন্দিতা কাঁদতে নেই শান্ত হও। জীবনের গতিই এই। সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটা। তাদের নির্বিবাদে সহ্য করতে পারলেই হয় জয়লাভ। তুমি ত' অবুঝ নও।" তিনি নন্দিতার হাতটা নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করেন। নরম ঠাণ্ডা হাত। acid এ পুড়ে গেছে যায়গায় যায়গায় তবু, কত—সুন্দর কত সমবেদনা, ঐ হাতটির মধ্যে।

কথা ঘোরাবার জন্যে বলেন "কাল ক্লাসে আসবেনা?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়।" নন্দিতা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে "ইতিমধ্যে অনেকগুলো লেকচার মিস্ হয়ে গেছে।"

—"তুমি এখন শুয়ে পড় নন্দিতা। তুমি ভয়ানক ক্লান্ত। কাল তা না হ'লে ক্লাস করতে পারবে না।"

নন্দিতা শুয়ে পড়ল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। জীবনের কান্না হাসি সুখ দুঃখ থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি।

ডাক্তার চৌধুরী আর একটা সিগার ধরালেন।

বাইরে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। মেঘে ঢাকা সকাল। শিশির স্নাত শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে কিছুক্ষণ। দুধারে ধূ ধূ প্রান্তর। একটির পর একটি বড় বড় গাছ ট্রেনের গতিকে কেন্দ্র করে যেন ঘুরছে।

ট্রেন ছুটে চলেছে: অবিরাম: অবিশ্রান্ত।

*　　*　　*　　*　　*

২

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইস্কুল ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা।

কলেজে সহ-শিক্ষা। আর্টস্ বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, শিল্প বিভাগ, ডাক্তারী বিভাগ, মায় কৃষি বিভাগ পর্য্যন্ত আছে।

সবুজ প্রান্তরের মাঝখানে ইস্কুল কলেজের মস্ত বড় বড় বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক একটি কীর্তিস্তম্ভ। তাদের ঘিরে রয়েছে লাইব্রেরী, মিলনায়তন, খেলাধূলোর মাঠ। ছোট ছোট দোকান—কাপড়ের, ব'য়ের, স্টেষনারির, ছোট একটা রেস্তোরাঁ পর্য্যন্ত।

তারপরই একটা সুন্দর বাগান: মস্ত বড়। নানা দেশীয় ফুল ও ফলের গাছে সাজান। মাঝখানে তার শ্বেত পাথরে তৈরী প্রকাণ্ড প্রদীপ। আলো জ্বলে দিবারাত্র।

বাগানের চারিধারে ছাত্রাবাস। একদিকে ছেলেদের, অন্য দিকে মেয়েদের।

সুন্দর পাকাবাড়ী এই ছাত্রাবাসগুলি। আধুনিক ব্যবস্থায় তৈরী। ছেলেমেয়েদের মাঝে ব্যবধান হল একটা উঁচু প্রাচীর। এটা হ'ল লোক দেখানো ব্যবধান। আসলে তারা অবাধে মেলামেশা করে, গল্প করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কড়া আইন কানুন বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব ঠিক ততটা। তার বেশী হয় অন্ধকারে, চিঠি পত্রে, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে—সবাক নয়, নির্বাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন বিশেষ কড়া, কিন্তু কার্য্যকরী নয়, কাগজে কলমেই তারা থাকে। ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব জ্ঞানের ওপর তাদের অসম্ভব বিশ্বাস।

খুব খারাপও বলা চলে। ভালও বলা চলে।

লোকালয় থেকে বহুদূরে। সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে এই নিকেতন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও যেমন আছে, তেমনি আছে কর্মকোলাহল মুখরিত চঞ্চল মুহূর্ত। একদিকে শিল্পসাধকের জন্যে শুধু সৌন্দর্য্য। অন্যদিকে বিজ্ঞান সাধকদের জন্যে গবেষণাগার, গ্যাস, ল্যাবোরেটরি, ইন্‌জেক্‌সন,

গিনিপিগ। দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও যেমন মিল ও তেমনি। ঐকান্তিক সাধনা তাদের যোগসূত্র।

ছাত্র ছাত্রীও আসে দেশ বিদেশ থেকে।

কেউ আসে বিদ্যার্জ্জন করতে। নির্জ্জনে, হিংসা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব কলহ —পূর্ণ পৃথিবীর বাইরে সাধনা করতে। কেউ আসে টাকার শ্রাদ্ধ করতে। অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে। কেউ আসে যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশার আকর্ষণে। তারা সবাই ধনী, সোনা দিয়ে মোড়া। জীবনে কখন অন্ন চিন্তা করতে হবে না। অভাব তাদের অর্থের নয়, অনর্থের।

এমন ধারা নানা রকমের ছাত্র ছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

ভোর ছটায় ঘণ্টা বাজে। শয্যাত্যাগ করবার সময়। সাতটার মধ্যে তৈরী হ'তে হবে। সাতটায় প্রার্থনার সময়। কেউ যায়, কেউ যায় না।

যারা যায় তাদের মধ্যে অনেকেই প্রার্থনা করতে যায়। কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা যায় প্রার্থনার টানে নয়, প্রার্থিতার টানে। আটটার মধ্যে স্কুল কলেজ প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে। ঠিক আটটায় ক্লাস আরম্ভ।

মেয়েদের হোষ্টেলের দক্ষিণ কোণে ডবল সিটেড রুম।

নন্দিতা আর বাসন্তী থাকে।

বাসন্তী দক্ষিণ-ভারতীয়া। বড়লোকের মেয়ে। এখানে এম, এ পড়ে হিষ্ট্রিতে। রং ঘন শ্যামবর্ণ। টানা টানা চোখ দুটির মধ্যে পৌরাণিকত্বের ছাপ আছে। সুন্দর মোটেই নয়, তবু একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করে। চেহারায় মাদকতা নেই শান্ত সরল। সুন্দর সে নয়—সুশ্রী।

নন্দিতাকে সে ভয়ানক ভালবাসে। হয়ত নিজের খানিকটা স্বভাব সে ওর চাউনির মধ্যে, আচার ব্যবহারে পেয়েছে। এখানে এসে প্রথম যেদিন বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল, তখন হাতের কাছে পেয়েছিল নন্দিতাকে। নন্দিতা চট্ পটে, সব অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অবাঙালী বাসন্তীকে সে নিজের কাছে টেনে নিল, একান্ত আপনার মতন করে। শিশু যেমন করে টেনে নেয় নূতন কেনা পুতুলকে। দুদিনের মোহ কিন্তু তবু কত আপন, কত নিজস্ব।

একসঙ্গে কলেজে পড়া যেন সমুদ্রতটে বালুর ঘর করা। দুদিনের ছেলেখেলা। তারপর ছাড়াছাড়ি, তারপর অনন্ত বিস্মৃতি। হয়ত ক্ষণিকের তরে দেখা হ'ল জীবনের কোন এক অজানা প্রান্তরে। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে রইল। নির্বাক বিস্ময়ে। একে অন্যের চোখে দেখল ফেলে আসা দিনগুলির আবছায়া প্রতিবিম্ব। ঘন কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে যেন অনেক দূরের প্রদীপটিকে দেখা। সে আলোর শিখা আছে কিন্তু অন্ধকার দূর করে না। মনে হয়ত ভেসে উঠল একটির পর একটি ছোট্ট ঘটনা ছোট্ট কয়েকটা কথা। হাসি কান্নার স্রোত। আনন্দ বিফলতা। আশা নিরাশা। ক্ষণিকের মোহ। তাসের ঘরবাড়ী। তারপর হয়ত মৌখিক আলাপ। পার্থিব জীবনের ছোট খাট দু একটা কথা। না বললেই যা নয়। কয়েকটা শব্দ মাত্র। হৃদয় তখন কেঁদে ফিরছে ছাত্র জীবনের আনাচে কানাচে। এইটুকুই জীবনের পরম সত্য। আর সব মিথ্যা। অলীক। অসঙ্গত। অভিনয়।

ভোর ছটায় নন্দিতা উঠল। বাসন্তীকে তুলল। দুজনে নিচে নেমে গেল স্নানের ঘরে।

চা এখানে দেওয়া হয় পৌনে আটটায়। অত দেরী করলে নন্দিতা বাসন্তীর চলে না। ওরা নিজেরাই করে নেয়। পালা করা আছে। সাতদিন নন্দিতা, তারপর সাতদিন বাসন্তী।

প্রার্থনায় ওরা যায় না। একান্ত নির্জ্জনের জিনিষ জনতার মাঝে হয়ে ওঠে অভিনয় কুৎসিত।

আটটায় দুজনে কলেজের পথে পা বাড়ায়। বিকেল পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি।

সেদিন প্রথমে নন্দিতা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করছে ঠিক দশদিন পর। প্রকাণ্ড ঘর। ছাত্র ছাত্রী মিলিয়ে মাত্র দশজন। ওষুধ আর গ্যাসের ধোঁয়ায় মিলিয়ে এক বিচিত্র গন্ধ। চারিদিকে বার্ণার জ্বলছে। কেউ গ্যাস তৈরী করছে, কেউ সালফিউরিক এসিড নিয়ে বুদ্ বুদ্ তৈরী করছে। লাল নীল নানান রঙের কেমিক্যাল। প্রকৃতিকে নিংড়ে নিয়ে যেন ওরা তাণ্ডব নৃত্য করছে। মানুষের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা কি? কেন? কবে? কোথায়? সবের শেষে এরা পৌছুতে চায়।

কাজ! কাজ! কাজ!

নন্দিতা আপন মনে পরীক্ষা করছিল। লাল রংয়ের খানিকটা এসিড একটা কাঁচের টামব্লারে ঢেলে তাতে এক ফোঁটা দুফোঁটা করে কি যেন ঢালছিল। পাশের টেবিলে প্রেমাঙ্কুর। তার হাউড্রোজনের প্ল্যাণ্টটা হঠাৎ ভেঙে গেল।

বার্ণারটা নিবিয়ে বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল "এসব আর ভাল লাগে না।"

প্রেমাঙ্কুর যুবক। ঠিক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। লম্বা ছিপ ছিপে চেহারা। লম্বা লম্বা চুলগুলো পেছন দিকে ওল্টানো। চোখে কাল সেলের চশমা। পরণে সাদা প্যাণ্ট হাফ সার্ট। সুন্দর বলা চলে না, তবে কুৎসিত নয়। অযাচিত রূপ চর্চা নেই। কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে সুন্দর বলে চালায় না। তবে ওকে দেখলে এইটুকু বেশ স্বচ্ছন্দে বলা চলে বিজ্ঞান ওর জন্যে নয়। অতিরিক্ত নম্র, কোমল। ভাব বিলাসী। জীবনটাকে যারা চালায় না, জীবন যাদের চালিয়ে নিয়ে যায়, ও তাদের দলেরই একজন। নিয়তির চাকায় নিজেকে ও বেঁধে দিয়েছে, কাদায় আটকে যেতে পারে আবার ছুটে যেতেও পারে।

নন্দিতা চমকে উঠল। হাত থেকে ওর বিকারটা পড়ে গেল। কৃত্রিম রাগে নিজেকে গম্ভীর করে নন্দিতা বল্লে "না যদি পোষায় তা'হলে ছেড়ে দাও। আমার কাজ নষ্ট করার কোন মানে হয় না।"

প্রেমাঙ্কুর ইতিমধ্যে নিজেই বেশ অপ্রস্তুতে পড়েছে, তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে "পারলে ত ছাড়তামই! কিন্তু ডাক্তার যে আমায় হতেই হবে!"

নন্দিতা নিজের টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বল্লে "কেন? ডাক্তারের কি কোন অভাব হয়েছে?"

—"বাবা! বাবার খেয়াল!—নিজে ডাক্তার তাই তিনি চান ছেলেও ডাক্তার হবে!

—"উত্তরাধিকারী সূত্রে?"

—"হ্যাঁ, যতটা সম্ভব!" ডাক্তার না হ'লেও নিদেন কম্পাউণ্ডার ত বটেই।

কথা আর এগোয় না। ওপাশ থেকে ডাঃ রক্ষিত আড়চোখে চেয়ে কেসে উঠেছেন। মানে, এই পর্য্যন্তই, আর না!

আবার কাজ আরম্ভ হয়। নন্দিতা নূতন করে কাজ আরম্ভ করে। প্রেমাঙ্কুর টেষ্ট টিউব আনতে ও ঘরে যায় অরে ফিরে আসে না। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ লক্ষ্য করে না। আবার অখণ্ড মনোযোগ।

কাজ। কাজ। কাজ!

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে আপন মনে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর শেষ হয়ে বিকেল এগিয়ে আসে। যে যার নিজের কাজ করে চলে। কারো যেন থামবার অবসর নেই। দুদণ্ড বিশ্রাম করবার অবকাশ নেই। সবই যেন জীবনের রথে বাঁধা ঘোড়া। চোখ বাঁধা। ছুটে যেতে হবে। গন্তব্য নেই, আছে গতি।

বিকেল ছটা।

যে যার কাজ সেরে চলে গেছে। নন্দিতা তখনও কাজ করে চলেছে। সময় অল্প। সুযোগ নেই। পারলে দুবছরের সব কাজ ও যেন একদিনেই শেষ করে ফেলে। মাঝে মাঝে থামে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাবার মৃত্যুজীর্ণ মুখখানি। অঙ্কের হিসেব। ক্যালেণ্ডারের পাতা। কে যেন ওর কানে কানে বলে "নন্দিতা সময় নেই, সুযোগ নেই, টাকা ফুরিয়ে এসেছে!"

আবার কাজ। আবার কেমিক্যাল!

সাড়ে সাতটায় ও আর পারে না। ক্লান্তি। আর দুমিনিট থাকলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। পা দুটো যেন পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেছে। হাত দুটো অবশ। মাথায় যেন কে প্রাণপণে হাতুড়ি পিটছে। নিজের টেবিলটি গুছিয়ে রেখে ও ওভারল খানা খুলে ফেলল। হাতদিয়েই চুলগুলো ঠিক করে নিল। খাতাখানা তুলে নিল। সামনে তার অনন্ত বিশ্রাম। ল্যাবরেটরির সহকারি এসে দাঁড়াল পথরোধ করে। ওর কাজ শেষ হতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি অথচ ডাঃ চৌধুরীকে একটা অবসরভেশনের ফাইল পৌঁছে দেওয়া নিতান্ত দরকার। নন্দিতা যদি ফেরার পথে ডাঃ চৌধুরীকে ফাইলটা দিয়ে যায় বড় ভাল হয়।

ডাঃ চৌধুরী! নন্দিতার ক্লান্তি অবসাদ সব যেন মিলিয়ে গেল। কিসের ক্লান্তি? কিসের অবসাদ? জীবনটাই ত কাজ, শুধু কাজ। ফাইলটা নিয়ে নন্দিতা বাইরে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার নেমেছে দিকে দিকে। তারায় তারায় আকাশ গেছে ছেয়ে।

ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় টাউনটি যেন আলোর মালা পরে অভিসার লগ্নের অপেক্ষায়। দূরে ছোটদের হোষ্টেল থেকে ভেসে আসছে মৃদু কলরব। ছোটদের অকারণ চীৎকার। কোলাহল।

লাইব্রেরীর বাড়ীটা অন্ধকার। অনাদি অতীতের বুকে অবলুপ্ত প্রেতাত্মার দল যেন আসর জমিয়ে বসেছে।

তার পাশ দিয়ে লাল সুর্‌কির রাস্তা। সামনেই রেস্তোরাঁ! বড়দের গুঞ্জরণে মুখরিত। পরনিন্দা আর পরচর্চা। মেয়েদের অকারণ শ্রাদ্ধ। ডান দিক দিয়ে লাল রাস্তা বেঁকে গিয়ে পড়েছে মিলনায়তনের সামনে। অতবড় হলঘরটা যেন কাঁদছে।

পেছনে ফেলে নন্দিতা এগিয়ে চললো। সোজা রাস্তা চলে গেছে ডাঃ চৌধুরীর ল্যাবরেটরির দিকে। মাঝে মাঝে ল্যাম্প-পোষ্ট। রাস্তার দুধারে ক্যানার সারি। হাল্কা বাতাসে ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ।

নিস্তব্ধ নিঝুম প্রকৃতি। ছেলেমেয়েদের অকারণ গোলমাল অনেক পেছনে পড়ে আছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে তারা মিলিয়ে গেছে। নন্দিতা যেন মনে মনে হাল্‌কা হয়ে উঠল। ক্লান্তি ঘুচে গেছে। অবসাদ নেই। গেট খুলে নন্দিতা ডাঃ চৌধুরীর ল্যাবরেটরির ভেতরে ঢুকল।

দরজার ধারে আপনিই থেমে গেল।

যাবে ভেতরে?

একটা শঙ্কা। লজ্জা। দ্বিধা। ভয়।

একবার ভাবল থাক দরকার নেই! না এলেই হত।

"কিন্তু।"—সেই আদিম সমস্যা। চিরন্তন প্রলোভন।

ফাইলটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই নন্দিতা সচকিত হয়ে উঠল।

ল্যাবরেটরি। সেই অদ্ভুত গন্ধ। বার্ণার। গ্যাস। হিসাব নিকাশ। এক কোণে ডাঃ চৌধুরী মনোযোগ সহকারে কিসের রিডিং নিচ্ছেন, আর তার পাশেই খাড়া পেন্সিল হাতে তার প্রথম সহকারী। এক কোণে টগবগ্ করে কি যেন ফুটছে। ওপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে সগর্বে। ডাঃ চৌধুরীর কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছে।

বড় ঘড়িটা চলছে। টিক্। টিক্। টিক্। ল্যাবরেটরি যেন চীৎকার করে বলছে কাজ। কাজ···

নন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ।

এক মিনিট। দুমিনিট। আধঘণ্টা।

কাজের নেই শেষ। অবিরাম। অবিশ্রান্ত।

শুধু কাজ। কাজ। কাজ।···

নন্দিতা টেবিলের ওপর ফাইলটা নিশ্চুপে রেখে, বেরিয়ে এল'।

দরজার কাছে এসে ফিরে চাইল পেছন দিকে।

ডাঃ চৌধুরী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এরাই যেন পৃথিবীর সারথী।

নন্দিতা বাইরে বেরিয়ে এল'। আবার সেই অনন্ত মুক্তি। সমস্তদিন কাজ করবার পরও এত ক্লান্ত নন্দিতা হয়নি।

আর দুমিনিট ভেতরে থাকলে ওর দম বন্ধ হয়ে যেত।

নন্দিতা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সোজা হোষ্টেলে ফেরা তার হল না। আজ যেন অনন্ত আকাশ ওকে ডাক দিয়ে বলছে "বাইরে, অনন্ত আকাশ তলে।"

তারার দল যেন আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। আরও বড়।

আকাশে বাতাসে যেন কিসের আলোড়ন। কিসের আনন্দ।

নন্দিতা আপন খেয়ালে পথ চলতে চলতে এসে দাঁড়াল শ্বেতপাথরের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপটির পাশে।

এ কি জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, না প্রদীপের আলোতে আহুতি দেবার আহ্বান, নির্বোধ পোকার মতন।

অন্ধকার থেকে আলোকে ?

না, অন্ধকারের মাঝে তীব্র আলোকের চোখ ঝলসানো অন্ধকারে ?···

পাশেই দাঁড়িয়েছিল প্রেমাঙ্কুর। হাতে তার একরাশ ফুল।

অন্ধকারের মধ্যে যারা জ্বল জ্বল করে প্রেমাঙ্কুর তাদেরই মধ্যে অন্যতম। দিনের নগ্ন আলোয় সে চলসই। অন্ধকারের মধ্যে কৃত্রিম আলোতে সে অদ্ভুত। অপূর্ব।

নন্দিতা থমকে দাঁড়ায়।

"তুমি ?"

"হ্যাঁ, চমকে উঠলে না কি ?"

নন্দিতা সত্যিই চমকে উঠেছিল। ডাঃ চৌধুরীর ল্যাবোরেটরী থেকে বেরিয়ে নন্দিতা হয়ত' প্রেমাঙ্কুরের কথাই ভাবছিল। নিয়তির বিচিত্র লীলা।

ফুলের গুচ্ছ এগিয়ে দিয়ে প্রেমাঙ্কুর বল্লে—

"তোমার জন্যে !"

মুখে তার আনন্দের রেখা, যৌবনের দম্ভ। যুবতীর অনন্ত প্রলোভন। নন্দিতা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকেই চেয়েছিল। প্রেমাঙ্কুরও।

লজ্জায় রাঙা হয়ে নন্দিতা বল্লে—

"কখন পালিয়েছিলে ক্লাস ছেড়ে ?

নিজেকে ধরা দিতে নন্দিতা চাইল না। অদ্ভুত অভিনয়। ফুলগুলি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।

"ছুটোর সময়।" প্রেমাঙ্কুর সগর্বে বল্লে।

আর দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না। নিজেকে হয়ত নন্দিতা ধরা দিয়ে দেবে। তাই হোষ্টেলের পথে পা বাড়াল। প্রেমাঙ্কুরও এগিয়ে চল্ল।

আবার নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। শুধু অস্পষ্ট গোলমাল। যেন সুরের ঝঙ্কার। সেতারের মূর্চ্ছনা। তেমনি সুন্দর। তেমনি মিষ্টি।

মেয়েদের হোষ্টেলে কে যেন বাজাচ্ছে সেতার। পূরবী।

নীরবে পথ চলেছে দুজন। পুরুষ ও নারী।

নন্দিতা ফুলগুলো তুলে গালের ওপর বোলাতে লাগল। কি নরম, কি সুন্দর। কি স্নিগ্ধ পরশ।

প্রেমাঙ্কুর নিজেই বলে চলে—

—"আমার আর ভাল লাগেনা, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।"

"—কোথায় ?"

—"যেখানেই হ'ক। পৃথিবীর কর্মকোলাহল থেকে বহুদূরে। সভ্যতার ছোঁয়াচ যেখানে লাগেনি। বেঁচে থাকবার জন্যে যেখানে উন্মত্তের মত পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে ছুটে চলতে হয় না। যেখানে আছে অনন্ত মুক্তি। নেই দাসত্বের শৃঙ্খল।"

"কেন ?"

"ডাক্তারী, বিজ্ঞান, ইনজেকশন, অপারেশন। এসব আমার ভাল লাগেনা। এসব জাল জোচ্চুরি। মানুষকে প্রতারণা করে জীবিকার সংস্থান। এতে আছে গতানুগতিক ধারা, দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। মনকে এসব করে আনে ছোট। গণ্ডীভূত।

নন্দিতা আড়চোখে একবার প্রেমাঙ্কুরের দিকে চাইল। দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি। ছেলেমানুষের মতন হেসে বল্লে—

"তোমরা পুরুষের অপভ্রংশ। নিজেদের বিকিয়ে দিতে জান, কিনতে পার না!"

প্রেমাঙ্কুর বুঝল না। প্রেমের কথা নয়। কবিতা নয়। সাহিত্য নয়।

ওরা প্রায় হোষ্টেলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রেমাঙ্কুর গলাটা একটু নাবিয়ে বল্লে, "নন্দিতা, মনে আছে রবিবারে পার্টির কথা। ঐ খাল পেরিয়ে ওপারে মহুয়া-বনের ধারে। তোমার মন খারাপ, জানি, কিন্তু তোমায় যেতে হবে,—আমার অনুরোধ!"

নন্দিতা হেসে উত্তর দিলে—না করলেও যেতাম।

"যাব, অনুরোধে নয়, নিজের মনের তাগিদে। কাজকর্ম থেকে সাময়িক বিরতি মানুষ মাত্রই চায়। তোমার মতন ভয়ে নয়। ক্লান্তিতে।"

একটু থেমে নন্দিতা আবার বল্লে—

"প্রেমাঙ্কুর, কিছু ফুল তুমি দিয়ে যাও। চমৎকার ফুল। মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে ভিজে মাটির একটা সুন্দর সোঁদা গন্ধ।"

প্রেমাঙ্কুরের কাছে এখন ফুলগুলো মহার্ঘ্য। ফুলগুলো নন্দিতার স্পর্শে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আরও কাম্য। তা ছাড়া ফুলগুলো নিয়ে নন্দিতা কেমন ছেলেমানুষের মতন খেলা করেছে, প্রেমাঙ্কুর তা জানে। ফুল আর ফুল নয়, ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবকের কাছে। বেঁচে থাকবার মতন একটা উপকরণ। অনেক কবিতার খোরাক। অনেক বড় বড় কথার উপলক্ষ্য।

প্রেমাঙ্কুর হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল নিয়ে নিল। আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়া লাগল। কয়েকটা ফুল মাটিতে পড়ে গেল। কার হাত থেকে কে জানে।

নন্দিতা গেট খুলে হোষ্টেলে ঢুকে গেল। প্রেমাঙ্কুর মাটির ফুলগুলো তুলে নিলে। সেও ফিরে গেল।

যৌবন রাজ্যের দুই প্রাণী। দুজনে দুরকম ছন্দ। ভাষা তাদের এক, দৃষ্টি আলাদা। দুজনের মধ্যে মিল আছে এক জায়গায়। মানুষের সেই আদিম আকাঙ্ক্ষা, চরম গন্তব্য—ভালবাসা।

রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। কোলাহল গেছে থেমে। সমস্ত দিনের

ব্যস্ততা শেষ হ'য়েছে—রাত্রির পায়ে এসে। নিদ্রা তার মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে—দিকে দিকে। নীরবতা সুরু করেছে তার নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষণিকের অভিযান। বিশ্ববিদ্যালয় টাউন যেন সুপ্তির কোলে নিজেকে দিয়েছে এলিয়ে।

বাসন্তী ঘুমিয়ে পড়েছে। নন্দিতা জেগে আছে খোলা জানলার দিকে চেয়ে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তার দৃষ্টি কে জানে। হয় ত অনন্ত আকাশ ভেদ করে সেই সীমাহীন কৌতূহলের রাজ্যে। যেখানে আছে শুধু চিন্তা, শুধু ভাবনা। অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি।

নন্দিতা ভাবছে "কোথায় এর আরম্ভ?"—

প্রেমাঙ্কুর তার গিটারখানা নিয়ে বসেছিল চুপচাপ। মাঝে মাঝে অজান্তে এলোমেলো হাতের আঘাতে তার টিপ্‌ছে। সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ, সৃষ্টিছাড়া। বাঁধা ধরা নিয়মে নয়, অনিয়মে। প্রেমাঙ্কুরও সেই ভাবনার বিশাল সমুদ্র পাথারে।

ভাবছে "কোথায় এর শেষ?"—

মস্তবড় দুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন বুকে করে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।

(৩)

ডাঃ চৌধুরীর বাংলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় ছোট ছোট লাল রংয়ের ইটের বাড়ী। অধ্যাপক মহল। তাদেরই এক প্রান্তে ডাঃ চৌধুরীর বাংলো। ঐশ্বর্য্যের চাপ নেই, আছে সাধনার আবহাওয়া। অকারণ কোলাহল নেই, চেঁচামেচি নেই। গাম্ভীর্য্যে ভরপূর। যেন বিরাট শান্তি ডানা মেলে বাড়ীগুলোকে আগলে রেখেছে কর্মকোলাহল থেকে।

বাড়ীর গেট পেরোলেই ছোট্ট একটা বাগান। মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে বাড়ীর বারাণ্ডা পর্য্যন্ত। বাগানে দিশী ফুলের গাছ। শেফালী, শিউলী, চামেলী। একটা লাল আভা চারি দিকে। চড়ুইর দল সন্ধ্যার তান ধরেছে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়।

কণিকাও বসে আছে। পরণে ফিকে গোলাপী জর্জিয়েট শাড়ী।

পায়ে—হাতে কাজ করা চামড়ার স্লিপার। কানে পাশা। রূপোর মিনে করা। হাতে কাঁচের এক গোছা লাল নীল চুড়ি। মুখ চোখ কৃত্রিম রঙে ঈষৎ রঞ্জিত। আধুনিক পুরুষের সমস্ত প্রলোভন যেন এক জায়গায় সঞ্চিত করা।

কারো ভাল লাগে, কারো লাগে না।

ডাঃ চৌধুরী কণিকার দিকে চেয়েছিলেন। কণিকাকে ভেদ করে দৃষ্টি গিয়েছিল বহুদূরে।

কি ভেবে তিনি বল্লেন—

"কণিকা! নন্দিতাকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করলে পার'। বড় ভাল মেয়েটি। এবার বেশ ভাল ভাবে পাশ করেছে। ও হ'ল তোমার রামকৃষ্ণ বাবুর মেয়ে। অতবড় বিদ্বান লোক; সেদিন হঠাৎ মারা গেছেন। মেয়েটি বড় দুঃখী। ভয়ানক কষ্টে আছে। আমাদের উচিত ওর দেখা শুনা করা। বাপ মা মরা মেয়ে।"

কণিকা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইল। সন্দেহ। কুৎসিত ইঙ্গিত। কণিকার চোখে যারা পৃথিবীকে দেখে তারা এমনি করে কুটিল দৃষ্টি দিয়ে সব জিনিষকে বিষিয়ে তোলে। স্নেহ তারা জানে না, প্রীতি, মায়া, মমতা তারা মানে না। তারা চেনে নারী পুরুষের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ 'কামনার আকর্ষণ'। এই সভ্যতার নাম আধুনিকতা, পাশ্চাত্য শিক্ষা।

খোঁচা দিয়েই কণিকা উত্তর দিল—

"তাই নাকি? মেয়েটি দেখতে কেমন?"

কোন উত্তর পেল না। আঘাত দেবার জন্যে কণিকা আবার বল্লে—

"জানই ত, তোমার ছাত্রীদের আমি ভয় পাই!"

সব কথা ডাঃ চৌধুরীর কানে যায় নি। তিনি কি যেন ভাবছিলেন। বল্লেন "মেয়েটি বড় সরল।"

কণিকা আবার আঘাত দিল—

"তারাই সময় সময় অত্যধিক ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।"

ডাঃ চৌধুরী নিরুত্তর।

নন্দিতা কণিকার ছোট্ট চিঠিখানা পেয়ে অবাক হ'য়ে গেল।

শনিবার ডাঃ চৌধুরীর বাড়ীতে পার্টি। ওর নেমন্তন্ন।

নন্দিতা ভেবে পেলে না, কেন ওর হঠাৎ নেমন্তন্ন! কেন?

শনিবার সকাল বেলা শুনলে প্রেমাঙ্কুরেরও নেমন্তন্ন।

কেন? কেন?

শনিবার সন্ধ্যাবেলা।

ডাঃ চৌধুরীর ছোট্ট বাংলোখানা যেন রঙচঙে রাঙতা। আধুনিকতার উজ্জ্বল আলোকে ঝক্ ঝক্ করছে অগ্রগতি মহিলার দল।

সবাই অধ্যাপক মহলের। কেউ স্ত্রী, কেউ বোন, কেউ মেয়ে।

নবাগত অধ্যাপকও কয়েকজন আছেন। কণিকা নিজে পছন্দ করে নেমন্তন্ন করেছে, কাজেই সবাই মার্জিত, সুসজ্জিত।

পুরুষের দল যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই অল্প বিস্তর কণিকাকে চেনেন। কণিকার কাছে এগিয়ে যায় তারাই, যারা সুন্দর সুশ্রী।

কণিকা সুন্দরী। সবাই তাঁর কৃপাদৃষ্টির অভিলাষী। কাজেই সবাই নিজেকে করে তুলেছে সুন্দর।

পুরুষ শক্তিশালী। পুরুষ নারীকে নাকি রক্ষা করে, শাসন করে। কিন্তু এদের দেখলে মনে হয় আমাদের ভ্রান্ত ধারণা বদলাবার সময় এসেছে। আধুনিক যুগে নারী রক্ষক, পুরুষ রক্ষিত। নারী চালক, পুরুষ চালিত। নারী পুরুষকে জয় করেছে।

ঘরখানি সুন্দর। ছিম্‌ছাম্।

এক কোণে একটি বড় অর্গান। কর্ণার ল্যাম্পে ফিকে সবুজ রংয়ের ল্যাম্পসেড দেওয়া। উজ্জ্বল সাদা আলোতে আধুনিকতাকে দেখা চলে না। কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। তাই অন্তরের শূন্যতাকে অনুজ্জ্বল আলোকে লুকিয়ে রাখা। এর নাম আধুনিক মার্জিত রুচি।

পুরুষের দল ব্যগ্রভাবে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে দাঁত চেপে হাসছে, কথা বলছে, হাসাতে চেষ্টা করছে। তাদের খুসী করাই যেন পুরুষদের একমাত্র চিন্তা। আকাঙ্ক্ষা। বাসনা।

মেয়েরা বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলছে।

"ও তাই নাকি?"...

"বেশ ত!"

"না, না, হতে পারে না!" ইত্যাদি ছোট ছোট কথা।

অকারণে ঠোঁট বেঁকান হাসি। বিস্ময়।

বেশী জোরে কথা বলা চলে না। হাসা চলে না। নড়া চলে না।
সভ্যতার আবরণ হয়ত' খসে পড়তে পারে। শঙ্কা।
এক কোণে কাউচে বসে নন্দিতা সবাইকে লক্ষ্য করছিল।
এখানে সে অচল!...
কণিকা পুরুষদের নিয়েই ব্যস্ত। মিঃ চ্যাটার্জী, মিঃ সেন, মিঃ নন্দী।
প্রেমাঙ্কুর অর্গানে বসেছে, গান গাইবে। আজ তারই জয়।
কণিকাদেবীর সৌন্দর্য্যের প্রদর্শনীতে সেই নবতম অবদান।

ডাঃ চৌধুরী অনুপস্থিত। তাঁর জায়গায় অফিসিয়েট করছেন মিঃ রতিন সেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগের অধ্যাপক। পুরুষোচিত চেহারা। ধবধবে ফর্সা। চমক লাগিয়ে দেন তাঁর চকচকে ধোপ দুরস্ত বেশভূষার সরঞ্জামে। অবিবাহিত। নারীর মন কি করে জয় করতে হয় তিনি জানেন! বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেরই।

দিদির ছোট বোনদের চকোলেট্ দেন। যুবতীদের দেন দুমুখো কথা। কথার সুগার কোটেট্ কুইনাইন্। যাঁরা উগ্র আধুনিকা নয়, তারা সুগারটুকুই উপলব্ধি করেন। কথাগুলো মিষ্টি লাগে। যারা আর একটু এগিয়ে গেছেন তাঁরা তলিয়ে দেখেন, সব কথার মানে খোঁজেন। তাঁরা সুগারটা বাদ দিয়ে কুইনাইন পান। তেতো লাগেনা, লাগে মিষ্টি। আরও পাবার জন্যে উস্কে দেন। সাধারণ কথাতেও তাঁরা মানে খোঁজেন।

প্রৌঢ়াদের বলেন বৌদি, মাসিমা, পিসিমা। তাঁদের রুচির প্রশংসা করেন। ছেলেমানুষী করেন। রান্নার তারিফ করেন।

বৃদ্ধাদের বলেন দিদু, ঠানদি।

আব্দার করেন। ধারাল মিষ্টি কথা দিয়ে ইয়ার্কি করেন। হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা তুলে তাঁদের আবার সেই অতীত দিনের দোরগোড়ায় নিয়ে যান। সেইটাই বৃদ্ধাদের একমাত্র দুর্বলতা।

তাঁরা গলে যান।

বিশ্ব বিজয়ী সুপুরুষ এই রতিন সেন।

সম্প্রতি মিঃ বাসুর স্ত্রী মলয়াকে কাবু করেছেন। তাঁকে হাত পা নেড়ে বোঝাচ্ছেন কেমন করে বিলেতে মডেলরা ভালবাসার অভিনয় করে।

প্রেমাঙ্কুর গান ধরল। সবাই চুপ। প্রথমে ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু শেষে গানের ঝঙ্কারে সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ। প্রেমাঙ্কুর যে এত

ভাল গান গাইতে পারে নন্দিতার জানা ছিল না। সে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

গানের পরে কণিকার বেহালা। তারপর রতিনের গান। তারপর প্রেমাঙ্কুর বাজাবে গিটার।

নন্দিতা পাশের খোলা দরজা দিয়ে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল। বারাণ্ডার শেষে ডান দিকে ডাঃ চৌধুরীর ষ্টাডি। নন্দিতাকে কেউ লক্ষ্য করল না। কারো সে অবসর নেই। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। স্বার্থ। আদিম যুগের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করাই তাদের কামনা, ভদ্রতাটা মুখোস মাত্র।

নন্দিতা এসে দাঁড়াল ডাঃ চৌধুরীর ষ্টাডির দরজায়। মাঝারি ঘর। ফিকে বাসন্তী রংয়ের। একধারে একটা বয়ের র‍্যাক। নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা বই। কয়েকটা বিজ্ঞান সমিতির জার্নাল। দেওয়ালে বাঁধানো ছবি রবীন্দ্রনাথের। টেবিলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প, কাঁচের।

একটা শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি। ছোট্ট।

টেবিলের ওপর একটা খোলা বই।

আরও খান কয়েক বেতের চেয়ার এলোমেলো ভাবে ছড়ান।

ঘরখানি যেন মন্দিরের মতন সৌম্য। গম্ভীর।

ডাক্তার চৌধুরী সিগার মুখে দিয়ে নতুন জার্নালটা দেখছিলেন।

পদশব্দ কানে এল। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন "কে ?"—

ভেবেছিলেন কণিকা।

নন্দিতা সভয়ে বল্লে "আমি—নন্দিতা !" গলাটা তার কেঁপে উঠল।

মুখ তুলে নিজেকে সামলে নিয়ে ডাঃ চৌধুরী বললেন—

"এস নন্দিতা, বস !"

নন্দিতা বসে পড়ল। ডাঃ চৌধুরী অপেক্ষা করলেন। হয় ত নন্দিতা কিছু বলবে। কিন্তু কেন এসেছে সে নিজেই জানে না, সে কি বলবে।

জার্নালের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—

"ও-ঘর থেকে চলে এলে যে ?"

ভাবল বলে "অন্ধকারে ভূতের মতন বসে থাকবার মতন ভদ্রতা

আমার নেই বলে, কিম্বা পরকে ছোট করে নিজেকে বড় করতে চাইনা বলে !”

প্রকাশ্যে বললে “এমনি !”

নিরবতা। কোন কথা নেই।

ও-ঘর থেকে ভেসে আসছে ছোট ছোট কথা। মুখ টেপা হাসি। ভাঙা ভাঙা ঠাট্টা। সভ্যতার বাঁধা বুলি।

ডাঃ চৌধুরী আবার বললেন—

“কেমন লেখাপড়া হচ্ছে ? ডিগ্রী পাবার সময় ত হয়ে এল, স্পেশাল সবজেক্ট কি নেবে ঠিক করলে ? সার্জারি না মেডিসিন !”

এইবার নন্দিতা যেন নিজেকে খুঁজে পেল।

—“মেডিসিন্। যেমন করেই হোক এক বছরের মধ্যে আমায় ডিগ্রী পেতেই হবে।”

আবহাওয়াটা খুব সহজ হয়ে উঠেছে। থেমে আবার বল্লে— “পারব না ?”

ডাঃ চৌধুরী এবার জার্নালটা মুড়ে রাখলেন। রাখতে রাখতে বললেন—“এক বছর, না ? অসম্ভব নয়…। অসম্ভব নয়। তুমি পারবে—তুমি বুদ্ধিমতী। তবে কি জান’ আগে থেকে ঠিক বলা যায় না।”

আবার নিরবতা। ডাঃ চৌধুরীর হাত দুটো টেবিলের ওপর। নন্দিতার দৃষ্টি সেই দিকে। Acid-এ পোড়া হাত দুটো—সুঠাম সুন্দর।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বল্লেন—

“তারপর কি করবে ?”

নন্দিতা কি যেন ভাবছিল। প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল। আবার যেন ফিরে এল বাস্তবতায় ! নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—

—“তারপর ! তারপর—চাকরি পাব হয়ত।”

ডাঃ চৌধুরী গম্ভীর। একটু ভেবে বল্লেন—

“চাকরি !—চাকরি !—চাকরি !”—একটু থেমে আবার তিনি বলে চল্লেন—

“সত্যি কথা কি জান নন্দিতা, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী আমি নই—সভ্যতার নামে নিজেদের যথেষ্ট ক্ষতি আমরা করেছি। আমাদের শিক্ষা

জীবনকে সুন্দর করবার অভিযান নয়, ধ্বংস করবার মারণাস্ত্র। প্রত্যহ আমরা আবিস্কার করি মৃত্যুকে এগিয়ে আনবার অব্যর্থ উপায়। সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা যখন ওজন হই তখন হিসেব করে দেখি ধ্বংস করবার কি কি উপায় আমরা পেলাম।" আবার থেকে তিনি বলে চল্লেন—

"বাইরের শান্তি আমরা হারিয়েছি, ঘরের যা বাকী আছে সেটা থাক না!"

"তবে তোমার কথা আলাদা। ঘর বাঁধবার চিরাচরিত তাগিদ তোমার মনে নেই—তোমার বুদ্ধি আছে, মনের জোর আছে। তুমি আধুনিকাদের মত উগ্র নও!"

নন্দিতা নির্বাক নিস্পন্দ। কি আছে বলবার? সমস্ত ঘরখানা যেন তাঁর গম্ভীর কথাগুলোর এখনও প্রতিধ্বনি করছে। একটা গম্‌গমে ভাব সমস্ত ঘরখানায়!

ডাঃ চৌধুরী নিষ্পলক চেয়ে আছেন শ্বেত প্রস্তর মূর্তির দিকে।

ওঘর থেকে থেমে থেমে ভেসে আসছে ছোট ছোট কথা।

—"ও তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ, দার্জ্জিলিংই ভাল!"

—"যদি ডাঃ চৌধুরা সময় না পান?"

—"তাতে কি হয়েছে আমি একলাই যাব তোমার সঙ্গে!"

কণিকা আর রতিনের কথাবার্তা খুব স্পষ্ট।

—"ঐ ছেলেটি কে?"

—"বেশ সুন্দর দেখতে না।—প্রেমাঙ্কুর। প্রশান্তর ছাত্র।"

—প্রশংসায় পঞ্চমুখ যে!

—হিংসে হচ্ছে নাকি?

প্রেমাঙ্কুর তখন গিটারে বাজাচ্ছে সুন্দর হাল্কা সুর।

আবার নানান কথা, ছোট, বড়, ঠাট্টা ইয়ার্কি।

প্রেমাঙ্কুরের বাজনা থেমেছে।

বারাণ্ডায় রেলিংয়ের থামে ভর দিয়ে রতিন কণিকাকে বলছে—

—"শাড়িখানা ভারি সুন্দর, তোমায় মানিয়েছে চমৎকার। শাদার ওপরে ফিকে গোলাপী পাড়ের পরেই যেন কাল বিন্দু। আড়চোখে চাইলে দৃষ্টি ফেরেনা। সোজা চাইতে লজ্জা করে।"

কথার স্থগার কোটেড কুইনাইন্।

কণিকা খোঁচা দিয়ে বলে—

"তোমারও তাহলে লজ্জা করে!"

"কেন নয়? অন্তরে না হ'ক বাইরে ত বটেই।"

—"লোকচক্ষু এড়িয়ে অন্ধকারে চাইলেই পার!"

—"তারও কি উপায় আছে, চোখ ঝলসে যায়। দৃষ্টি শক্তি আপনিই ক্ষীণ হয়ে আসে!"

কথাগুলি ডাক্তার চৌধুরীর ষ্টাডিতে ভেসে আসে। তাঁর হাত মুষ্টি বদ্ধ হয়। মনের, দেহের, সমস্ত শক্তি যেন মুঠোর মধ্যে জড় হয়। চোখের দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কপালের রেখা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

নন্দিতা ভয় পায়।

ডাঃ চৌধুরী বলেন, "চল নন্দিতা, আমরা ওঘরে যাই!"

পার্টি শেষ হয়ে গেছে।

সবাই চলে গেছে। ঘরখানা যেন বাসরের বাসি মালা।

হাল্কা সেণ্টের গন্ধ এখনও ভাসছে। ছোট ছোট কথা যেন এখনও দেওয়ালে জমা হ'য়ে আছে।

চেয়ার সোফা কোচগুলো এখনও তাদের স্পর্শের প্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ। ডাক্তার চৌধুরী বারাণ্ডার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে।

কণিকা গেটে দাঁড়িয়ে রতিনকে বিদায় দিচ্ছে।

বারাণ্ডা থেকে ওদের কথাবার্তা শোনা যায় না। ভেসে আসে শুধু কণিকার হাসির উচ্ছ্বাস।

রতিন দূরে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সুরকির রাস্তা তার পদশব্দের প্রতিধ্বনি করল কড়্! কড়্! কড়্!

কণিকা গেট বন্ধ করে এল।

বাইরে করুণ আর্তনাদে চিৎকার করছে নিশাচর পাখী। রাস্তার আলোতে শিউলি ঝাড়ের ছায়া পড়েছে ঘাসের ওপর। আচমকা দেখলে ভয় করে। হঠাৎ ভূত বলে মনে হয়।

বারাণ্ডায় স্বামীকে পাশ কাটিয়ে কণিকা ড্রইংরুমে ঢুকে গেল। ডাঃ চৌধুরী কণিকার পেছন পেছন ঘরে ঢুকলেন। একটা থম্ থমে

ভাব। তীব্র অশান্তি তাঁর চেহারায় যেন ফুটে বেরিয়েছে। রুদ্ধ চাপা আর্তনাদ। তাকে দমন করে রাখার অসীম প্রচেষ্টা।

কণিকা অর্গানটা বন্ধ করছিল।

ডাঃ চৌধুরী এগিয়ে গেলেন ঠিক অর্গানটার ধারে। বল্লেন—"সন্ধ্যাটা বেশ কাটল না?"

জিজ্ঞাসা নয়। মন্তব্য নয়। কঠিন বিদ্রূপ। কণিকা চুপ করে থাকতে পারল না। তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে—

—"মন্দ কি, চিরাচরিত সংসারের বাঁধা ধরা গতির মধ্যে একটু ছন্দ বৈচিত্র্য।"

ডাঃ চৌধুরী একটা সিগার ধরালেন। নিজেকে সামলে নেবার এইটিই তাঁর একমাত্র অস্ত্র।

কণিকা অর্গান বন্ধ করে ফুলদানির ফুলগুলো গুছিয়ে রাখছিল। একটু ছাই ঝেড়ে ডাঃ চৌধুরী বল্লেন—

—"ছন্দ বৈচিত্র্য নয়, ছন্দ পতন।"

পুরুষদের প্রতি কণিকার আছে অতৃপ্ত একটা দুর্বলতা। কামনা। ক্ষুধা। ডাঃ চৌধুরীর কথার মধ্যে ছিল একটা কুৎসিত ইঙ্গিত। অপ্রিয় সত্য। কণিকা ঘুরে দাঁড়াল। ডাঃ চৌধুরী অদ্ভুত ভাবে হাসতে আরম্ভ করলেন। কণিকা নিজেকে সামলাতে পারল না। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—"সেটা তোমাদের বক্র দৃষ্টি ভঙ্গি। তোমরা প্রত্যেক বিষয়ে চুল চেরা বিচার কর।"

ডাঃ চৌধুরী নিরুত্তর। আবার অখণ্ড নিরবতা। ডাঃ চৌধুরী পায়চারি করছেন। কর্ণার ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোতে দেখা যায় প্রচ্ছন্ন একটা চাঞ্চল্য। ওধারের কর্ণার টেবিলের ওপর রতিনের ফোটাখানা যেন হাসছে।

কণিকা বলে চলল—আমি জানি তুমি রতিনকে হিংসা কর। সে তোমার মত সৃষ্টিছাড়া নয়। পুরুষ যে শুধু বাইরের নয়, ঘরেরও সে কথা সে জানে!

ডাঃ চৌধুরী নির্ব্বাক। কণিকা রতিনের কথা বলেনি। রতিনকে উপলক্ষ্য করে অন্তরের গভীর স্থলের একটা মস্ত বড় অভিমান প্রকাশ করেছে। অভিযোগ। তার স্বামীর বিরুদ্ধে। তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধে।

কণিকা আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চায়, তার এই উন্মত্তের মতন ছুটে চলবার মূলে আছে স্বামীর বিরুদ্ধে একটা গভীর অভিমান।

সে আজ নিষ্ঠুর অগ্নিশিখা। পুরুষের মন নিয়ে সে ছিনি মিনি খেলে। তার মনে আগুন লাগিয়ে দেয় ওর রূপের চমক দিয়ে। সে যখন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়, ও তখন মজা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রতিশোধ।

একজন পুরুষের কাছে যে অবহেলা কণিকা পেয়েছে, সে আঘাত, সে অবহেলা ও ফিরিয়ে দেবে প্রত্যেক পুরুষকে।

ডাঃ চৌধুরী নিশ্চুপে তার কথা শোনেন। যেটুকু কণিকা বলে, তার চেয়ে বেশী তিনি বোঝেন, কিন্তু নিজেকে ধরা না দিয়েই বলেন—

"হঠাৎ রতিনের কথা কেন ?"

কণিকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছে। এলোমলো কথা বলে। অসংযত। প্রলাপ।

বলে—"আমি তোমায় অনুকম্পা করি। একদিন তোমায় ভালবেসেছিলাম। বিয়ে করেছিলাম। আমি, সামান্য কণিকা, তোমার মতন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে স্বামীরূপে পেয়ে, ভালবেসে, সমাজে বন্ধুমহলে ঈর্ষার আগুন জ্বেলেছিলাম, কিন্তু···"

কণিকা আর বলতে পারে না। কান্নার রুদ্ধ বেগ ওর গলা চেপে ধরে। কথা আটকে যায়। কত কি ওর বলবার আছে, কিন্তু বলতে পারে কৈ অভিমানে, অশান্তিতে, দুঃখে, নিজেই ছুটে চলে ধ্বংসের মুখে। প্রকাশ করতে পারে না কিছুই। থেমে বলে—"আমি শ্রান্ত। ক্লান্ত। আমি আর পারছি না।"

ডাঃ চৌধুরী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। বাইরের পৃথিবী অন্ধকার। নির্জ্জন। আকাশে অজস্র তারা জ্বল জ্বল করে চেয়ে আছে। পৃথিবী কি থম্‌কে দাঁড়িয়ে কণিকার কথা শুনছে ? দূর থেকে ভেসে আসে গোলমাল। অস্পষ্ট। ডাঃ চৌধুরীর কানে তা লাগে চাপা কান্নার মতন। সৃষ্টি কি আজ কাঁদছে নাকি ? কার দুঃখে। কার জন্যে এই সমবেদনা ?

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর ?···

না, কণিকার ?

কণিকা নিজের মনেই বলে চলে—

"আমি তোমার স্ত্রী। তাছাড়া আর কিছু কি আমার আছে?"

ডাঃ চৌধুরী বলেন—

"তোমার কাছে সেইটাই ত সব। বেঁচে থাকবার সার্থকতা। চরম সান্ত্বনা।"

কণিকা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। জানালার বাইরে অনন্ত আকাশ। বিরাট শূন্যতা। ওর অন্তর হাহাকারে কেঁদে ওঠে। বাইরের শূন্যতা যেন আর বাইরে নেই, ওর অন্তরে। বলে—"সান্ত্বনা! সান্ত্বনা! সান্ত্বনা!—সেইটাই কি যথেষ্ট। তুমি এটা বোঝনা কেন যে আমাদের মধ্যে আজ যা সম্বন্ধ তা বিয়ে নয়। অত্যাচার। অবিচার। আত্মপ্রবঞ্চনা।

কণিকা স্বামীর ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বামীত' নয় যেন পাথরের মূর্ত্তি। অতীতের শূন্যগর্ভ থেকে টেনে এনে কেউ এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে! শান্ত। স্থির। নির্বাক।

কণিকা রুদ্ধ অশ্রু চাপতে পারে না। বলে—"আমি কি করেছি তোমার?"

কণিকা আর বলতে পারে না। জানলার কাঁচে নিজের গালটি টিপে ধরে। কি ঠাণ্ডা! ও যেন অনেকখানি সান্ত্বনা পায়। এক বিন্দু জল গড়িয়ে ডাঃ চৌধুরীর হাতের ওপর পড়ে। তিনি হাতটা সরিয়ে নেন। অশ্রুবিন্দু অলীক একটা রেখা টেনে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, হয় ত তাঁর পায়ের ওপর। শুকিয়ে অশ্রুর রেখা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কণিকা আবার বলে—"আমি রতিনকে ঘৃণা করি।"

ডাঃ চৌধুরী কণিকার দিকে চাইলেন। সে যেন মূর্তিমতী কান্না। দুঃখ। অশান্তি। অভিমান।

সামনে বিরাট শূন্যতা। দুর্ভেদ্য অন্ধকার। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। কোথায় এর শেষ সীমা? হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। দৃষ্টিতে শেষ দেখা যায় না। অনুভূতিতে অনুভব করা যায় না।

ডাঃ চৌধুরী সেই দিকে চেয়েছিলেন। কি দেখছেন? কি ভাবছেন?

প্রেমাঙ্কুর বলে—

"তোমার আজ কি হয়েছে বল ত?"

নন্দিতাকে প্রেমাঙ্কুর ভোলাতে চায়। নন্দিতা বোঝে। নিজের মনকে দূরে সরিয়ে রেখে বলে—

"কৈ কিচ্ছুনা!"

—কথা বলছ'না যে?

নন্দিতা বলে "ভাবনার যেখানে শেষ, কথার সেখানে আরম্ভ।"

প্রেমাঙ্কুর জিজ্ঞেস করে "তুমি এত ভাব নন্দিতা?"

প্রেমাঙ্কুরের কথায় জড়তা নেই। হাল্কা সুর আছে। আবেদন। অনুরোধ। নিবেদনও।

কথাগুলো নন্দিতাকে ছুঁয়ে যায়। নন্দিতা ধরা ছোঁয়ার বহু উর্দ্ধে। কিন্তু তবু।

অন্ধকারে মানুষের মন হ'য়ে পড়ে দুর্ব্বল। রাত্রির নির্জ্জনতা, নীরবতা, মর্ম্মান্তিক আঘাতে বলে "তুমি ও আমার মতন নিঃস্ব।"

দিনের বেলায় হয়ত হেসে বলত' 'কিছু না!'

কিন্তু অন্ধকারে বল্ল—"পৃথিবীতে যাদের কোন মূল্য নেই, সঙ্গীতের রাজত্বে তারা দেবতা। কথায় যা বলবার ক্ষমতা তাদের নেই গানে তা তারা সহজেই বলে যায়।"

প্রেমাঙ্কুর যেন অন্য জগতের মানুষ। তার গানে কি এত সুর আছে? বলে "আমরা কত নির্বোধ। যেটা জানি, তবু সেটা জিজ্ঞাসা করি!"

নন্দিতা হেসে ফেলে।

বলে "সত্যি আমরা কত কম বুঝি—কত ছেলেমানুষ আমরা!"

গেট খুলে নন্দিতা হোষ্টেলে ঢুকে পড়ে। প্রেমাঙ্কুর শেষ বারের মতন নন্দিতাকে দেখে বারাণ্ডার অনুজ্জ্বল আলোতে।

অন্ধকার প্রেমাঙ্কুরকে গ্রাস করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ঘড়ীতে বাজে নটা।

ডাঃ চৌধুরী তখনও জানলার ধারে দাঁড়িয়ে।

ঠাণ্ডা বাতাস থেকে থেকে জানলার ওপর এসে আছড়ে পড়ে।

পাশে কণিকা নেই। পাশের হিমশীতল মানুষটি তাকে জমিয়ে দিতে পারে।

সে চলে গেছে।

ডাঃ। চৌধুরী পিছন ফিরে চাইলেন।

কণিকা পাশের ঘরে চলে গেছে। তার ছায়াখানি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

তার কথা সে শেষ করে যায় নি। একটা কথা সে বলতে পারেনি। রুদ্ধ অভিমানে। কান্নার স্রোত তাকে বাধা দিয়েছিল।

অশ্রু মিলিয়ে যাওয়ায় নিশ্চুপে বল্লে—

—"কিন্তু তবু আমি তোমায় ভালবাসি !"

বিরাট প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল নন্দিতা আর প্রেমাঙ্কুর।

পার্টির মাদকতা এখনও প্রেমাঙ্কুরের মনে। তার খুব ভাল লেগেছে পার্টি। বল্লে—"বিকেলটা বেশ কাটল।"

নন্দিতা ভাবছিল অন্য কথা !

বল্লে—"হুঁ !"

তারপর থেমে আবার বল্লে—

"Professor মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে যান। আমার ভয়ানক ভয় করে। থম্ থমে আকাশের পানে চেয়ে নন্দিতার সেই কথাই বারবার মনে পড়ছিল। বিরাট শূন্যতার মধ্যে অসীম রহস্য। দুটোর মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে। ঐক্য। একে বাদ দিয়ে যেন ওর কথা ভাবা যায় না।

আকাশের অগুণতি তারা যেন তাঁর মন। দেখা যায়। অনুভব করা যায়। ছোঁয়া যায় না। অনন্ত কৌতুহল।

প্রেমাঙ্কুরের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সে ভাবছিল অন্য কথা। এই বিরাট শূন্যতা, নির্জ্জনতা আর অন্ধকারের মধ্যে—মনকে সহজে চেনা যায়। চাইলেই পাওয়া যায়। দিনের নগ্ন আলোয় যা চাইতে ভয় করে ; রাত্রির অন্ধকারে তা সহজেই পাওয়া যায়। অন্ধকারে পালাবার পথ থাকে না। অভিনয় ধরা পড়ে না।

কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই।

বিরক্ত হয়ে ডাঃ চৌধুরী জানলা বন্ধ করে দেন। সশব্দে।

তবু যেন তৃপ্তি। মন তবু পায় খানিকটা সান্ত্বনা। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। আবার সেই তীব্র অশান্তি। আবার সেই মর্ম্মান্তিক শূন্যতা।

পাশের ঘর থেকে একটা সিগার এনে ধরালেন। তারপর আবার পায়চারি আরম্ভ করলেন। কিন্তু তবু সেই শূন্যতা। অব্যক্ত একটা ক্রন্দন। হাহাকার তাঁকে যেন পেয়ে বসেছে। এ কোন নিষ্ঠুর প্রেতাত্মা আজ তাঁকে অনুধাবন করছে?

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে···!

প্রত্যেক পদক্ষেপে···।

তাঁর ভাবনায়। তাঁর চিন্তায়। প্রত্যেক শব্দ মনে হয় যেন পৈশাচিক চিৎকার।

তারা যেন চেঁচিয়ে বলছে। "বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই।" ধরণীর আজ এ কি মর্মান্তিক আর্তনাদ!

আলো নিভিয়ে দিলেন।

বাইরের ক্ষীণ আলো ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে আবার সেই তীব্র অশান্তি।

নিস্তার নেই। নিস্তার নেই। নিস্তার নেই।

ডাঃ চৌধুরী ছুটে গেলেন লাইব্রেরী ঘরে। একটা বই নিয়ে পড়তে বসলেন। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। সব অর্থহীন।

তাঁর নিত্য সহচর বইগুলো পর্য্যন্ত আজ বিরূপ। তারা কোন সান্ত্বনা দিলনা, কোন সহানুভূতি দিলনা।

আজ তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানের পূজারী। ডাঃ চৌধুরী। সবাই আজ পরাজিত।

কণিকা। কণিকা। কণিকা।

সবাই আজ কণিকার দিকে। সবাই কণিকার সহানুভূতিতে কাঁদছে।

বুদ্ধমূর্তি। বই। আলো। অন্ধকার।

তিনি চোখ বুজলেন। কণিকার মূর্তি স্পষ্ট ভেসে উঠল। উগ্র আধুনিকা কণিকা নয়। উন্মত্ত কণিকা নয়। পুঞ্জিভূত লালসার মূর্তিমতী কণিকা নয়।

প্রেমিকা কণিকা। ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর একান্ত নিজস্ব কণিকা।

নারী আজ পুরুষকে গ্রাস করেছে।

হাতের ওপর মিলিয়ে যাওয়া অশ্রুবিন্দুর অলীক রেখা আবার ফুটে উঠল। একি জ্বালা। একি যন্ত্রণা। একি আর্তনাদ।

সবাই যেন চীৎকার করে বলে—

"মুক্তি নেই। মুক্তি নেই। মুক্তি নেই।"

আজ যেন তিনি প্রবল ঝড়ে পড়ে যাওয়া দেবদারু।

কে জানত আজকের এই সামান্য কয়েকটা কথা, কণিকার অসংযত প্রলাপ, ডাঃ চৌধুরীকে এমন মর্মান্তিক আঘাত করবে।

সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর গভীর রেখাপাত করবে। কে জানত ?

আজ প্রথম ডাঃ চৌধুরীর মনে হ'ল কণিকাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন।

কিন্তু কে দায়ী ?···

···তিনি নিজে ?

না, তাঁর সাধনা ?

না, কণিকা ?

না, নিয়তি ?

কণিকাকে কেন্দ্র করে তিনি ভবিষ্যত কল্পনা করতে আরম্ভ করলেন। অন্ধকারের বুকের ওপর একটির পর একটি অস্পষ্ট ছায়া।

স্ত্রী কণিকা, স্বামী প্রশান্ত। তাঁদের দুজনকে ঘিরে রয়েছে পরম তৃপ্তি। সুখ। শান্তি।

এক বিরাট আকার দৈত্য এসে সে কল্পনা পদাঘাতে ভেঙে দিল।

কে জানে কে এই বিরাটাকার দৈত্য ?
নিয়তি ?   না রতিন ?

পাষাণ প্রশান্ত। নিশ্চুপ। নির্বিকার। তার সামনে ঘূর্ণীর মতন প্রলয় নাচনে উন্মত্ত কণিকা। সে ছুটে চলেছে ধ্বংসের শেষ সীমায়।
পাশে কে যেন হাসছে। বিরাট অট্টহাস্য, ক্রূর। ব্যঙ্গ। তাচ্ছিল্য।
কে ?
নিয়তি ?   না তাঁর সাধনা ?
সমস্ত বিশ্ব যেন চেঁচিয়ে বলছে—
মুক্তি নেই। মুক্তি নেই। মুক্তি নেই।

৪

গরমের ছুটি।
ইউনিভারসিটি টাউন যেন ঘুমন্ত শিশু।
যেন বিরাট আকৃতি কঙ্কাল। যুগ যুগ ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছে।
ছেলেমেয়েরা বাড়ী গেছে।
ক্লাসরুমগুলো নির্ঝুম।
একরাশ ধূলো জমেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলকাকলী নেই। বড়দের তর্ক নেই। পরনিন্দা নেই। পরচর্চ্চা নেই।
মাঝে মাঝে বড় বড় বাড়ীগুলো ঝাড়া হয়। শব্দ হয়। মনে হয় যেন চেয়ার টেবিল ব্ল্যাকবোর্ডগুলো ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠছে।
ঘণ্টা বাজেনা।
প্রার্থনার সমবেত কণ্ঠস্বর সমস্ত নিকেতনটিকে জাগিয়ে তোলে না।
ক্লাস নেই। লেকচার হয় না।
অহেতুক গোলমাল নেই।
অনেকে বাড়ী গেছে। কিছু যায়নি।
সামনে পরীক্ষা। নির্জনে পড়া করতে হবে।

ডাক্তারী বিভাগের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে ব্যবস্থা করেছে গরমের ছুটিতে পড়াশুনো করবে নিশ্চিন্তে।

এদের দলে নন্দিতাও আছে।

প্রেমাঙ্কুর এদের সহপাঠী হলেও, পড়াশুনায় তার তেমন মন নেই, বাড়ী চলে গেলে আশ্চর্য্য একটা কিছু ঘটত না।

কিন্তু সেও রয়ে গেল।

পড়ার তাগিদে নয়; সেটা উপলক্ষ মাত্র। নন্দিতার জন্যে। বিরহে, মিলনের পূর্ণতা উপভোগ করার কথা সে কবিতায় পড়েছে, নিজেও সে বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা সে লিখেছে।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা কল্পনা মাত্র, বাস্তব নয়। তাই প্রেমাঙ্কুরও রয়ে গেল।

নন্দিতা ওকে দেখে আর ভাবে—

"পৃথিবীর জটিল জীবন পথের অবোধ শিশু। মাটির পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করে। জীবনকে কতটুকুই বা চেনে!"

ও কি পুরুষ না···

"কিন্তু কত সুখী ও! পৃথিবীর এলোমেলো গতির বহু উর্দ্ধে ও!"

আর নন্দিতা!

পার্থিব জগতের অন্য সাধারণের মতই ও আর একজন।

কাজ। পরীক্ষা। আপন বলতে পৃথিবীতে আর কেউ নেই। পিতার শেষ ইচ্ছা। সাধনা। এবং সর্বোপরি অর্থ। দারিদ্র্য।

অদূর ভবিষ্যত যেন ওর গলা টিপে ধরে। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে নন্দিতা যেন শুনতে পায় সময়ের দ্রুত পদশব্দ।

সময় নেই। সময় নেই। সময় নেই।

বই নিয়ে নন্দিতা পড়তে বসে।

কিন্তু পড়া ওর হয় না।

সেদিন বিকেল বেলা।

মিলনায়তনে ওদের মিটিং ছিল। পরদিন বসন্ত উৎসব, তারই আয়োজন করা হবে। জীবনের চঞ্চল গতি থেকে সাময়িক বিরতি। সাধনার পৃথিবীর বাইরে যে বিরাট পৃথিবী ছুটে চলেছে দিনরাত তার স্রোতে ক্ষণিকের জন্যে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়া।

মিটিং শেষ হয়েছে। ঠিক হয়েছে ওরা কজনে মিলে নৌকো করে যাবে ঐ দূরের পাহাড়তলীর মহুয়াবনে। কিছুক্ষণ নৌকোয় বেড়াবার পর মহুয়াবনে গিয়ে বনভোজন। রান্না ওরা নিজেরাই করে নিয়ে যাবে। তারপর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসা।

সঙ্গে বুড়োর দল কেউ থাকবে না। তাঁরা থাকতে রাজি, কিন্তু এরা সঙ্গে নিতে নারাজ।

কারণ, অনেক বিপদ আছে।

প্রথমতঃ, তাঁদের প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়াচে যৌবন স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। ভদ্রতার আবরণ। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা যৌবনের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছেন যুগ যুগ আগে, তাঁরা যৌবনের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। যৌবনের উত্তাপে ঝলসে যান। আবার সেই ফেলে আসা জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওঁরা ছুটে যান, সে দূরে সরে যায়। পুরোনো পাতাগুলো উল্টে নিতে চান। পারেন না। ফলে তাঁরা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠেন। যৌবনকে তাঁরা হিংসে করেন।

ফলে সংঘর্ষ।

যৌবনের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের।

ক্ষতি দুদলের।

তাই এরা ঠিক করেছেন বৃদ্ধদের বাদ দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন গরমের ছুটিতে অফিস ঘরে বন্ধ।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে। অধিকাংশই চলে গেছে। আছে মাত্র তিনজন। নন্দিতা, প্রেমাঙ্কুর আর বাসন্তী।

বাসন্তীও এবার বাড়ী যায়নি। অজুহাত পরীক্ষা। ওর যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু নন্দিতা ছাড়েনি।

আবোল তাবোল কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। সত্যাগ্রহ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ। রথযাত্রা থেকে রবীন্দ্রনাথ। 'বুদ্ধ কথা' থেকে যুদ্ধ কথা। কথা প্রসঙ্গে আদর্শবাদের কথা উঠল। পরিশেষে জীবনের আদর্শ। প্রসঙ্গের অবতারণা করছে প্রেমাঙ্কুর। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় নিয়মিত লেখে, অতএব সে সাহিত্যিক। মেয়েরা তাকে শ্রদ্ধা করে, কারণ সময় সময় শক্ত শক্ত কথা খুব গুছিয়ে ও বলতে পারে। মেয়েদের

পক্ষে এটা বড় কম কথা নয়। এইখানেই ওদের সবচাইতে দুর্বলতা। যে কথা ওরা বোঝে তা ওরা শুনতে চায় না, যেটা বোঝে না সেইটার প্রতি ওদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

দুজন যুবতী শ্রোতা। একজনকে ও ভালবাসে, আর একজন সুশ্রী। নিজেকে জাহির করবার এই প্রবল প্রলোভন প্রেমাঙ্কুর এড়িয়ে যেতে পারলে না। প্রেমাঙ্কুর বলতে আরম্ভ করলে। মানুষের জীবন একটা বিরাট শূন্যতা। শরতের ভেসে যাওয়া মেঘের মতন আছে একটা মৃদু গতি। আমি জীবনকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি। বেঁচে থাকতে হবে বলে বেঁচে আছি। নিয়তি আমাদের জোর করে ঠেলে ফেলে দেয় সংসারের মধ্যে। একটা অন্ধকার ছোট্ট গলির মতন নোংরা। কয়লার খনির মতন অন্ধকার। জীর্ণ। দীর্ণ। কুৎসিত আবর্জ্জনা। কোন রকমে আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিই—কাটাতে হবে বলে। নিয়তির পরিহাস।

একদিন নিজের অজান্তেই মানুষ যাত্রা করে জীবনের পথে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে তার পথ। আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু অন্ধকার। একদিন হঠাৎ সে দেখে আলো। মুক্তির শুভ্র আলো। অন্ধকার সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে। মৃত্যু এসেছে। সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বাসন্তী নির্বাক বিস্ময়ে কথাগুলো শোনে। শুনবেই ত। বাঙলা দেশের মেয়েদের মতন ওর স্বভাব।

ওর চোখে মুখে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। প্রেমাঙ্কুর ওর কাছে হয়ে উঠেছে অদ্ভুত একটা কিছু। প্রেমাঙ্কুর ওকে জয় করেছে। বাসন্তীর চোখে ও এখন একজন সামান্য ছাত্র নয়, সাহিত্যিক নয়। ও এখন একজন দার্শনিক। কবি। ওকে শুধু শ্রদ্ধাই করতে ইচ্ছে করে না, ভালবাসতেও ইচ্ছে করে।

বাসন্তী ভাবে ওযেন অনন্ত আকাশ। চোখে দেখা যায়। কিন্তু অস্তিত্ব নেই। দৃষ্টিতে ওকে আপন করে পাওয়া যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।

প্রেমাঙ্কুর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ও একটু বেশী গম্ভীর হ'য়ে গেল। যেন বিশ্ববিজয়ী বীর।

প্রেমাঙ্কুর জানে যৌবনের রাজ্যে নারী পা দিলেই দুর্বলতা ঠিক কোনখানটায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বাঙলাদেশের মেয়েদের।

অন্য সময় হলে নন্দিতা কোন কথা বলত না। নিজের সামান্য অভিজ্ঞতায় এত বড় বড় কথা বলা ও পছন্দ করে না।

যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা ধারা যে জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, আজ সামান্য নন্দিতা তার বিষয়ে কি মন্তব্য করবে? কিন্তু আজ প্রেমাঙ্কুরের কথায় ওর যেন চমক ভাঙল। জীবনের প্রতি একি জঘন্য অবিচার?

একি কুটিল দৃষ্টিভঙ্গি?

জীবনটা কি এতই তুচ্ছ! এতই হেয়! এতই বিকৃত!

এ শুধু অপমান নয়। নিয়তির প্রতি অবিচার!

জীবনের প্রতি অবহেলা। প্রবঞ্চনা।

নন্দিতা বলে—

জীবনটা কি এতই ছোট?"

মাতৃহারা শিশু আমি একদিন জীবনের পথে পা বাড়ালাম। আজ এসে দাঁড়িয়েছি জীবনের এক চৌমাথায়। একদিকে সাধনা। অন্যদিকে গতানুগতিক জীবন।

একদিকে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক। শুধু সংগ্রাম। অন্যদিকে বিফলতার তিমির অন্ধকার। পরিষ্কার পথ। যেদিকে ইচ্ছে যেতে পারি।

কিন্তু তবু জীবন কত সুন্দর। কত মনোরম।

বেঁচে থাকা কত মধুর।

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা উপলব্ধি করি আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু সেইটাই কি সব? আমরা কি শুধুই এমনি করে বেঁচে থাকব? গতানুগতিক ভাবে? আমাদের জানতে হবে আমরা বেঁচে আছি। আমাদের ভাবতে হবে আমরা বেঁচে আছি। জীবনকে চিনতে হবে। অনুভব করতে হবে। তার কাছে হাত বাড়ালেই যেমন আমরা পাই, তেমনি তাদের দিতেও হবে। জীবনের পরিপূর্ণতায় বেঁচে থাকা। সেইটাই ত বেঁচে থাকবার চরম সার্থকতা, সেইটাইত জীবন।

সেইটাইত জীবনের আসল পরিচয়।

নন্দিতা থামল। কেন এসব কথা ? কাকে বলছে সে ? কে শুনছে তার কথা ?

বাসন্তী ?

সে ত রক্তমাংসে গড়া বড় লোকের মেয়ে। অন্নচিন্তা তার নেই। জ্ঞানের পিপাসা তার নেই। এসব কথা ভেবে তার কি লাভ হবে ? এ সবের তার কিসের প্রয়োজন ?

প্রেমাঙ্কুর ?

ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবক। জীবনকে সে চিনতে শিখেছে কবিতার মধ্যে দিয়ে। বটতলার উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। দেবদাসের পাতায়। এসব কথার সে কি বুঝবে ? সে ত জীবনকে দেখে কালো কাঁচের মধ্যে দিয়ে। ভাবে জীবনটা বুঝি দুঃখের সমুদ্র, তাতে আছে শুধু কান্নার ঢেউ।

নন্দিতা চুপ করে।

প্রেমাঙ্কুরের সাহস নেই তার সঙ্গে আর ওসব আলোচনা করে। নিজেকে মনে করে নন্দিতার তুলনায় কত ছোট। কত নগণ্য। ভয় পায়। নন্দিতা যদি ওকে হেয় মনে করে। ছোট মনে করে!

তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্যে বলে—

"চল নন্দিতা। বাইরে খোলা মাঠে বেড়াই। বদ্ধ ঘরে মাথা ধরে গেছে।"

নন্দিতা বোঝে। বলে—

"চল! বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি।"

তিনজনে বাইরে আসে।

সূর্য্য অস্ত গেছে। কিন্তু অন্ধকার নামেনি।

পথে তিনজনেই নীরব। বাসন্তী এসব কথা বোঝেনা। বলেনা। বক্তার দিকে নির্বাক চেয়ে থাকে।

প্রেমাঙ্কুর নন্দিতাকে ভয় পায়। তার সামনে আর কখনও এসব কথা বলবে না।

নন্দিতা প্রেমাঙ্কুরের অবস্থা উপলব্ধি করে।

সন্ধ্যা নামল ওরা যখন প্রস্তর প্রদীপের ঠিক পাশটিতে।

অন্ধকার আর আলোকের তখন অপূর্ব সংমিশ্রণ।

নন্দিতা চেয়ে ছিল প্রেমাঙ্কুরের দিকে। ভাবছিল ও কত সুন্দর।

যেন অবোধ শিশু।

এ কি স্নেহ? মায়া? মমতা? অনুকম্পা?

—না ভালবাসা?

আজ পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব।

আকাশ সকাল থেকে ঘোলাটে। গুরুগম্ভীর আবহাওয়া বুকে নিয়ে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতি যেন ব্যথাতুরা মাতৃ হৃদয়ের মতন ভারাক্রান্ত।

প্রবল বর্ষার পর গভীর রজনী। তারই মতন ভয়াবহ। থমথমে। চারখানি নৌকা আটটি যৌবনের জোয়ার বুকে নিয়ে ভেসে চল্ল। এক একটি নৌকাতে দুজন করে। সবার আগে আগে চলেছে নন্দিতা আর প্রেমাঙ্কুর।

আজ এরা কেউ আকাশ মানবে না, বাতাস মানবে না। মুক্ত বিহঙ্গমের মতন স্বাধীন এরা।

এদের বুকে নিয়ে নৌকা গুলোও যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ছুটে চলেছে পূর্ণ উদ্যমে। জীর্ণ নদীতে ঢেউ উঠেছে। প্রকৃতি কি আবার পূর্ণ-যৌবনা?

এদের সঙ্গে সমতালেছুটে চলতে চলতে, বাতাসও বুঝি হাঁপিয়ে পড়ে।

আজ এরা স্বাধীন। মুক্ত।

জীবনের কর্ম কোলাহল মুখরিত দিনের সীমানা পেরিয়ে আজ এরা এসে পড়েছে আর এক নূতন রাজ্যে।

এখানে কাজ নেই। ভাবনা নেই। শৃঙ্খল নেই। সমাজ নেই। সংসার নেই। আছে শুধু যৌবন। আছে শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা। শুধু ছুটে চলে যাওয়া। বিরাম হীন। বিশ্রাম হীন।

কোন কুলেতে ভীড়বে এদের স্বাধীনতার জোয়ারে ভেসে যাওয়া যৌবনের নৌকো?

সমস্ত সকাল নদীর বুকে কাটিয়ে দুপুরে এরা সবাই নামল মহুয়া বনের ঘাটে।

হৈ চৈ। গান। বাজনা। খাওয়া দাওয়া।

ছোট বড় নানান রকম কথা। ঠাট্টা। ইয়ার্কি।

সাহিত্য। কবিতা। দর্শন।

তার পর বিশ্রাম।

সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন পর্য্যন্ত যা হ'ল তা শুধু ছন্দবদ্ধ।

পাঁচজনে মিলে আনন্দ করতে হবে, নইলে চলে না।

জনতা। জনতা।...

সবাই এবার চায় নির্জনতা। নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাবার পূর্ণ স্বাধীনতা! কিন্তু প্রকাশ করতে ভয় পায়। সবাই চায় সবাইকে এড়িয়ে শুধু নির্জনতা। কিন্তু কেউ প্রকাশ করতে সাহস করে না।

সবাই ভাবে—যদি ওরা কেউ কিছু মনে করে। ঠাট্টা করে।

যান্ত্রিক সভ্যতা। ছন্দবদ্ধ সংস্কার। সবাই চায় তাকে ভেঙে খান্ খান্ করে আবার ফিরে যেতে সেই অতীতে, যখন মানুষ ছিল প্রকৃতির শিশু। স্বাধীন ভাবে বিচরণ করার ছিল অবাধ স্বাধীনতা। মানুষ যখন নিজেকে পেত' আপন করে। সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবে। সমাজ, সংস্কার, সভ্যতার নিয়মকানুন মানুষের মনকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেনি।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠল নন্দিতার কথায়।

নন্দিতা বল্লে "এবার সভ্যতার বাঁধ ভেঙে, প্রকৃতির শিশু আমরা প্রকৃতির কোলেই ফিরে যাই। ঘর সংস্কার বন্ধন সব ভুলে যাই।"

সবাই চাইছিল এই স্বাধীনতা, কিন্তু বলবার মতন সাহস ছিল না কারো।

এ ওর মুখ চাওয়া চায়ি কল্ল।

নন্দিতার কথায় মনে মনে সায় দিল সবাই। প্রকাশ্যে বললে "কেন এই ত বেশ!"

কাপুরুষ সমাজের জীব। দাসত্বের শৃঙ্খল পরে এরা নিজেদের ধ্বংস করেছে সম্পূর্ণ রূপে। মনে যা চায়, মুখে তা প্রকাশ করবার মতন সামান্য সাহসও এদের নাই।

মানবতার একি শোচনীয় পরাজয়।

সবাই আবার চুপচাপ।

সবাই ভাবে নন্দিতা আবার যদি বলে! সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু নন্দিতা আর বললে না।

প্রেমাঙ্কুর অস্থির হয়ে উঠল। বল্লে—

"সেকালে মানুষ বেশ ছিল। মুক্ত বিহঙ্গমের মতন।" থেমে বল্লে "আবার যদি আমি পারতাম, ছুটে যেতাম সেই যুগের কোলে!"

বাসন্তী চুপচাপ এককোণে শুয়েছিল। ঘাস দিয়ে দাঁত খুঁটছিল। বল্লে "হ্যাঁ, বনে বনে ছুটোছুটি, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে, যেখানে ইচ্ছে! কনক চেঁচিয়ে বল্লে "হ্যাঁ, যার সঙ্গে ইচ্ছে!"

সবাই হেসে উঠল। মানুষটা ওরা এ যুগের হলেও, মনের গভীর অন্তস্থলে এখনও সেই সুদূর অতীতের কালিদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা বাসা বেঁধে আছে। কনকের কথা সেই মনের প্রকাশ। সবাই তাই উপভোগ করেছে।

অভিজিৎ বল্লে "বসে বসে কোমরে বাত ধরল।"

শ্যামলিমা বল্লে "শুধু কোমরে নয়, মনেও!"

হয় ত সত্যিই তাই, কিন্তু উপায় নেই। স্বাধীনতার তৃপ্তি যারা জানে না, পরাধীনতা তারা নির্বিঘ্নে সহ্য করে। ওরা আজ সবাই চায় আপন খেয়ালে ভেসে বেড়াতে, কিন্তু পারে কই? সমাজ সংস্কার আর লৌকিকতা ওদের গলা চেপে ধরে আছে। বিদ্রোহ করবার ক্ষমতা নেই। লোক লজ্জার ভয়। অথচ হৃদয় ওদের আজ জেগে উঠেছে প্রকৃতির শ্যামল ছোঁয়াচে।

ওদের প্রত্যেকের মনে আরম্ভ হোল ঘোর দ্বন্দ্বের।

অন্তরের সঙ্গে আভিজাত্যের।

প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর।

মনের সঙ্গে মানের।

সবাই নীরব। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

নন্দিতাই ওদের পথ প্রদর্শক। অন্তর তার শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। মন তার লোকলজ্জা বা ভয়ের দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়।

নন্দিতা বল্লে "আর বসে বসে ভাল লাগেনা—আমি চল্লাম।

বলে নন্দিতা জনতাকে পেছনে ফেলে ঘন কাশ বনের ধারে মিলিয়ে গেল। প্রেমাঙ্কুর এবার উন্মত্ত। ও ছুটে যাবে নন্দিতার পেছনে। কিন্তু···

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতন প্রেমাঙ্কুর হয়ে উঠল চঞ্চল। লোহার গারদের পেছনে ও যেন লোলুপ সিংহ। উন্মত্ত। অধীর। ক্ষিপ্ত।

সকলেই তাই।

এ ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে। অব্যক্ত কৌতুহল।

প্রেমাঙ্কুর ভয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে মাতালের মতন উঠে দাঁড়াল। আজ ও রুদ্র বৈশাখ। সমাজের চীৎকার ওকে থামাতে পারবে না। চক্ষুলজ্জা পারবেনা ওর গতির পথ রোধ করতে। ভবিষ্যতের ঠাট্টার তীর ওকে টলাতে পারবে না। সবাই স্তম্ভিত। সচকিত।

ও থমকে দাঁড়াল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে "নন্দিতা বড্ড ছেলেমানুষ, ফিরবার সময় হয়ে এল, অথচ ঠিক এই সময়ে ও ছুটে চলে গেল।"—

আপন মনেই বলছিল। শেষ কথাগুলো জড়িয়ে গেল। ওর নিজের কানেই কথাগুলো ফিরে এল, অর্থহীন, অসংযত প্রলাপ। অপ্রস্তুত। কানদুটো দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে।

এতদূর এগিয়ে আর পেছলে চলে না। সলজ্জ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিল।

আপন মনেই বল্লে "দেখি কোথায় গেল আবার।"

বলতে বলতে ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর একে একে সবাই।

ভেসে গেল লজ্জার আবরণ; সমাজের শৃঙ্খল; বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন। যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান পুঞ্জীভূত প্রেম আজ প্রকৃতির পরশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অন্য সবের আজ পরাজয়। আজ এরা ছাত্র ছাত্রী নয়। আধুনিক আধুনিকা নয়। পরিচিত অপরিচিত নয়। আজ এরা প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল। আজ এরা শুধু পুরুষ আর নারী।

বসন্ত উৎসবের আয়োজন রইল পড়ে। প্রয়োজনের কাছে আয়োজনের পরাজয়। এবার শেষ বাসর। পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে; প্রকৃতির কোলে।

প্রেমাঙ্কুর নন্দিতাকে ধরলে কাশবনের প্রান্তে। সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে শ্যামল প্রান্তর। নন্দিতা দৌড়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে।

প্রেমাঙ্কুর আসবে, নন্দিতা জানত। পেছনদিকে না চেয়েই বল্লে—"উঃ রোদ্দুরে কি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

ঘাসের ওপরই নন্দিতা বসে পড়ল। একটা ঢিপির ওপর মাথা রেখে নন্দিতা শুয়ে পড়ল।

ও যেন একরত্তি সরল শিশু। সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ নেই। পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রোদ্দুর যেন স্নিগ্ধ আলোকের ঝর্ণা। স্বচ্ছ আলোকে নন্দিতা আরও সুন্দর, আরও কমনীয়, আরও সরল। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে এক কণা আলো যেন ঝর্ণার ওপর প্রতিফলিত। তেমনি চক্‌চকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন এক একটি মুক্তো, এলোমেলো সাজান। ছুড়োহুড়িতে মুখচোখ রাঙা। রামধনুর রং মাখান জলে কে যেন ওর মুখখানা রাঙিয়ে দিয়েছে।

দূর থেকে কে যেন ওর মুখে ছুড়ে মেরেছে একমুঠো আবির। নন্দিতা আজ বসন্তের প্রতিমূর্তি। তার সব সৌন্দর্য্য। সব মাদকতা। সব মাধুর্য্য।

এক ঝলক হেসে নন্দিতা বল্লে "দেখ আমি একটু শুয়ে পড়ব ভাবছি, তুমি আমায় পাহারা দেবে, কেমন!"

প্রেমাঙ্কুর যেন আকাশের চাঁদ মাটির ওপর থেকে কুড়িয়ে পেল। সমস্ত জীবনের ঐকান্তিক সাধনা দিয়েও যে ব্যবধান সে পেরিয়ে যেতে পারতনা, নন্দিতার একটি কথায় তা ঘুচে গেল। নিজেকে সামলাতে না পারলে প্রেমাঙ্কুর হয়ত পড়েই যেত। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে চেয়ে রইল নন্দিতার দিকে ; এক দৃষ্টে। দৃষ্টিত নয় যেন আগুনের হল্‌কা। মহাকবি কালিদাস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিশ্ব সাহিত্যের সব কবি আর প্রেমের কবিতা ওর মনকে এক সঙ্গে ছেঁকে ধরল। সে দৃষ্টি হিংস্র লোলুপ ব্যাঘ্রের মতন ভয়ঙ্কর।

আধুনিক বাংলা কবিতার মতন দুর্ভেদ্য।

অমাবস্যা রজনীর মতন ভয়াবহ।

লালসা বাসনা আর তীব্র আকাঙ্ক্ষার পুঞ্জিভূত দাবানল।

পুরুষের দৃষ্টি যৌবনের আলোতে প্রদীপ্ত!

নন্দিতা ভয় পেল।

বল্লে "দেখ, বিশ্বাস করছি, দুষ্টুমি কোরনা যেন!"

নন্দিতার কথায় প্রেমাঙ্কুর নিজেকে খুঁজে পেল।

বল্লে "না! জানই ত পুরুষই চিরদিন রক্ষক!"

—"তবু বিশ্বাস নেই, আজ তোমরা যে কথা বল, কাল তা অচল করে দাও। সুবিধাবাদীর দল অসুবিধাকে এড়িয়ে যাও, অন্য কেউ আপত্তি করে না, কারণ ভবিষ্যতে তাহ'লে তাদেরই জবাবদিহী করতে হবে।"

বলেই নন্দিতা তার কোমল হাতখানা দিয়ে সূর্য্যের আলোকে চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল।"

প্রেমাঙ্কুর ও পাশটিতে বসে পড়ল।

মাঝখানে ব্যবধান শুধু একটা ছোট্ট ঝোপের।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে নন্দিতা দেখলে আকাশটা কি নীল।

অনন্ত। বিরাট।

তার বুকের ওপর অবাধে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য চিল।

কি স্বাধীন ওরা।

ওদের সমাজ নেই; শৃঙ্খলা নেই; বেঁচে থাকবার জন্যে মারামারি করতে হয় না।

দ্বন্দ্ব নেই। কলহ নেই। হিংসা দ্বেষ নেই।

সভ্যতার চীৎকার ওদের জীবনকে ছোট করেনি; গণ্ডীভূত করেনি। যন্ত্রের আর্তনাদ নেই।

প্রেমাঙ্কুর চুপ করে থাকতে নারাজ। কিছু বলবে যা হ'ক একটা কিছু। জীবনের সার্থকতা যেন রূপ নিয়ে ওর চোখের সামনে ছুটো-ছুটি করছে, বলছে আমায় ধর এই বেলা, পরে আর পাবে না।"

বল্লে—"কি দেখছ অমন করে নন্দিতা?"

নন্দিতা বল্লে "ছি, চেঁচিওনা অমন করে; একটা বোলতা। আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করেছি, কি একটা ছোট্ট জিনিষ নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কত চেষ্টা, তবু না। অথচ না নিয়ে ও কিছুতেই যাবে না।"

প্রেমাঙ্কুর লক্ষ্য করে দেখল। বল্লে—

—"অত চেষ্টা করে নিয়ে যাবার, জিনিষই বটে এক কণা ধূলো!"

থেমে নন্দিতার দিকে চাইল।

নন্দিতা কত সুন্দর কত সরল। সে তখনও বোলতার দিকে চেয়ে আছে। আবার বল্লে—"ঠিক আমারই মতন! এও নিশ্চয় ওদের

ডাক্তারী পড়ছে। সমস্ত জীবন সাধনা করে এক কণা ধূলো সঞ্চয় করা। আমাদের মধ্যে কত মিল।

নন্দিতা এবার দৃষ্টি ফেরাল।

হেসে বল্লে—"মোটেই না, তুমি একদম ওর মতন নও।"

—"তা হলে?"

—"তুমি? তুমি হলে ঠিক যেন একটি ফড়িং, দিনরাত খালি নেচে গেয়ে বেড়াও; অথচ তোমার উচিত মন দিয়ে লেখাপড়া করা।"

ভয়ানক দুষ্টু নন্দিতা। লেখাপড়ার কথা, পরীক্ষার কথা ও যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না। কেমন করেই বা পারবে?

অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে ওর মনে পড়ে গেল বাবার কথা।

এমনি করে ও একদিন বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মাঠের ওপর শুয়ে পড়েছিল। বাবা বলেছিলেন "অমন করে যেথানে সেখানে শোওয়া উচিত নয়, বিপদ হতে পারে।"

ছেলেবেলায় বিপদ মানেই মৃত্যু। কোথায় যেন দুটার মধ্যে গভীর সংযোগ। ছেলেমানুষের মতন নন্দিতা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল—"আচ্ছা বাবা লোক মরলে কোথায় যায়?"

বাবা বলেছিলেন "আকাশে!"

আজও সে ধারণা ওর বদলায়নি। যুক্তি নয় ধারণা।

আকাশের দিকে চেয়ে ওর তাই থেকে থেকে বাবার কথাই মনে পড়ছে। আকাশের বুকে শুয়ে শুয়ে বাবা নিশ্চয় ওর দিকেই চেয়ে আছেন। সেই মৃত্যুমলিন কণ্ঠে তিনি যেন বলছেন—"মা, তুই ত আমার ছেলে। তোকে ডাক্তার আমি করবই করব।"

তাই এই অনন্ত আকাশতলে শুয়েও নন্দিতার মনে উঁকি মারছে পরীক্ষা; লেখাপড়া!"...

প্রেমাঙ্কুর কৃত্রিম রাগে নিজেকে গম্ভীর করে বল্লে—

"নন্দিতা, আজ এই নির্জ্জন প্রান্তরের অতুলনীয় শান্তি আর সারল্যের মধ্যে সভ্যতার কুৎসিত ব্যঙ্গকে টেনে আনা তোমার অন্যায়।"

প্রেমাঙ্কুর এবার আপনহারা। নিজের মনের প্রতি অনুপরমাণু আজ নন্দিতাময়। ও বলে চলে—

"জান নন্দিতা, এত শান্তি, এত তৃপ্তি, এত আনন্দের পরশ জীবনে

কোনদিন আমি পাইনি। আজ মনে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। এত আপন ভাবে, এত পূর্ণতার মধ্যে আমি কোনদিনও পাইনি। তোমার সাহচর্য্য আমার জীবনে যে কত অমূল্য তা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না।"

থেমে আবার প্রেমাঙ্কুর বলে চলে—

"পরীক্ষা এবার আমি দেব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাবার ইচ্ছাও আমি পূর্ণ করব। কিন্তু একদিন আমি নিজেকে সঙ্গীতের ধারায় ভাসিয়ে দেব। সেইটাই আমার কামনা। জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ছন্দবদ্ধ বিজ্ঞানের ধারায় নিজেকে উৎসর্গ করতে আমি পারব না। আমি পাগল হয়ে যাব।"

—আরও অনেক কথা প্রেমাঙ্কুর বলে যেতে পারত। নদীর কূল যখন ভাঙে তখন সীমানার মধ্যে থাকে না। একূল যখন ভাঙে অন্য কূল তখন গড়ে ওঠে, নইলে মানবতার হ'ত ধ্বংস।

প্রকৃতির শ্যামল শোভা প্রেমাঙ্কুরের মন যেমন ভাঙল, নন্দিতার মনও তেমনি সেই সঙ্গে গড়ে উঠ্‌ল!

বাধা দিয়ে নন্দিতা বল্লে—"মানুষ অত সহজে পাগল হয় না, প্রেমাঙ্কুর!"

প্রেমাঙ্কুর ক্ষিপ্তের মতন বলে চলে—"হয় নন্দিতা। কিন্তু কেমন করে হয় তা কোনদিনও তোমায় বোঝাতে পারব না। অনেকে নিজের অন্তরকে তৃপ্তি দেবার জন্যে পারিপর্শ্বিক অবস্থাকে ভুলে যায়। আবার অনেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বজায় রাখতে গিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে। কেমন জান? কেউ ট্রেণে উঠে লোক সরিয়ে নিজের জায়গা করে নেয়, আবার কেউ নিজে সরে পরের জন্যে জায়গা করে দেয়, কিন্তু কে যে ভাল আর কে যে খারাপ তা কে বলবে?"

নন্দিতা বলে—"কিন্তু প্রেমাঙ্কুর..."

—"আমায় বলতে দাও নন্দিতা" প্রেমাঙ্কুর বলে চলে—"তুমি জাননা, ডাক্তারী পড়তে আমার কত খারাপ লাগে। স্পষ্ট মনে আছে একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা। একটি ভিখারিণীর ডেলিভারি কেস্। আমরা ২৪ জন একে একে তাকে পরীক্ষা করলাম। চব্বিশ জন পুরুষ। সে চুপ করে শুয়ে রইল কোন কথা বলেনি; কিন্তু তার সেই

করুণ দৃষ্টি—তার সেই নির্বাক কাতরোক্তি আজও আমার চোখে স্পষ্ট ভাসছে। তারপর কতদিন, কতরাত আমি তার কথা ভেবেছি। শিক্ষার দোহাই দিয়ে, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কি নৃশংস ভাবে তার নারীত্বকে নিয়ে তার শ্লীলতাকে নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলেছি।

—তুমি হয় ত বলবে আমি কাপুরুষ। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ভাবি সত্যিই কি তাই···

কথাগুলো শেষ করতে পারে না। নন্দিতা সভয়ে বলে—

"প্রেমাঙ্কুর একটা গান গাইবে ?"

—"ভয় পেলে ? প্রেমাঙ্কুর আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে। বলে "থাক্ তাহলে আর বলব না !" আবার বলে—

—"কিন্তু নন্দিতা, অবাক্ হয়ে যাই ভাবলে, তোমার সংস্পর্শে এসে আমি কি ভীষণ বদলে গেছি। কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন আমার।"

দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ওদের দুজনকে দোলা দিয়ে যায়। প্রেমাঙ্কুর আরও কাছে সরে আসে, নন্দিতার বুকের ওপর থেকে ওর হাতটা তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বলে—

"কেন জান ?"

নন্দিতা নিরুত্তর। সমস্ত গা দিয়ে ওর আগুন বেরুচ্ছে। ঘামে নন্দিতা ভিজে গেছে। কপালের ওপর আবার দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আকাশটা হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠেছে।

নববধূর সিঁথিতে প্রথম সিঁদূরের মতন। টক্‌টকে।

সূর্য্যের দীপ্তি নেই। আলোর শিখা আছে।

আকাশের চিলের দল কোথায় পালাল ?

নির্জনতা যেন আরও জমাট বাঁধা।

মৃদু বাতাস এদিক ছুটোছুটি করছে। এলোমেলো।

পাখীরা গাছে গাছে ধরেছে সন্ধ্যার কলতান।

প্রকৃতি এবার সত্যিই জেগে উঠেছে।

—"কেন জান ? প্রেমাঙ্কুর চুপচাপ নন্দিতার কানে কানে বলে—"তোমার ভালবাসায় !"

খুব আস্তে। নিজের কানেও যেন না আসে।

নন্দিতা চোখ বুজে। যা কানে শোনবার তা দেখে উপলব্ধি করা যায় না।

নিস্তব্ধ নিঝুম প্রকৃতি।

চমক ভাঙল' বাসন্তীর ডাকে।

রাত্রির অন্ধকার তার এলোচুল বিছিয়ে দিয়েছে চারিদিকে।

এবার ফেরার পালা।

অন্ধকার।

কাল জলের ওপর এলোমেলো ভেসে চলেছে নৌকাগুলো।

প্রত্যেকটিতে একটি করে হারিকেনের আলো।

তাতে আলো হয় না, অন্ধকার জমে ওঠে।

সবার পেছনে নন্দিতা আর প্রেমাঙ্কুর।

চাঁদকে গ্রাস করেছে কালো মেঘ।

নৌকো ওদের ভেসে চলেছে আপন খেয়ালে।

অন্ধকারে কাউকে দেখা যায় না।

হারিকেনের লাল আলোতে নন্দিতা আরও সুন্দর।

—"এবার আমি দাঁড় বাইব।" নন্দিতা উঠে দাঁড়াল।

ও আজ অস্থির। চঞ্চল।

—"চুপ করে বসে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না।"

—"আর আমি?" প্রেমাঙ্কুর হেসে বলে "আর আমি বুঝি চুপ করে বসে বসে তোমায় দেখব?"

—"হ্যাঁ, তাই।"...বলে নন্দিতা একরকম জোর করেই প্রেমাঙ্কুরকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

প্রেমাঙ্কুর আজ যেন কলের পুতুল।

নন্দিতা দাঁড় বেয়ে চলেছে।

এক এক ফোঁটা জল পড়ছে। হারিকেনের আলোতে সেগুলো যেন এক একটি রক্ত বিন্দু।

প্রেমাঙ্কুর নন্দিতার ঠিক পাশটিতেই বসে পড়ল।

মৃদু পরশ। হাল্কা উত্তাপ।

—"নন্দিতা তুমি আজ কি অপূর্ব! কালকের নন্দিতা আর আজকের

নন্দিতায় কত প্রভেদ। কালকে ছিলে বিগ্রহের মতন গম্ভীর, আজকে যেন বাংলা সুরের মতন হাল্কা।”

—“তাই নাকি?” নন্দিতা বলে “আমিও তাই ভাবছি, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আবার সেই অতীতের নন্দিতা!”

প্রেমাঙ্কুর নন্দিতার পরশে হয়ে উঠেছে প্রদীপ্ত।

সে বলে “সত্যি, তুমি কত সুন্দর! তুমি যে এত সুন্দর সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আমি বুঝিনি। প্রকৃতির স্নিগ্ধ আলোতে আমি তা অনুভব করছি।”

থেমে গেল। আরও অনেক কথা বলবার আছে, কিন্তু জড়তা ওর গলা টিপে ধরল। এলোমেলো ভাবে বল্লে—

—“এমনি ভাবেই আমি তোমাকে চাই নন্দিতা। চিরদিন···”

রাত্রি। অন্ধকার।

নদীর কাল জলের ওপর নৌকো ভেসে চলেছে।

অদূরে একটা নৌকোর আবছায়া রেখা।

একবিন্দু আলো।

অন্ধকারে ওপারের গাছগুলোকে দেখায় যেন একদল দৈত্য।

নৌকোগুলোকে মনে হয় এক একটা মস্ত বড় কাল পাথর। আকাশ আজ অন্ধকারে নিরাকার।

হারিকেনের আলোতে নন্দিতা যেন আরও মনোরম।

প্রেমাঙ্কুর বল্লে—“আচ্ছা নন্দিতা, তুমি আমায় ভালবাসো?

—“হ্যাঁ”—ভাষার অস্পষ্ট অনুকরণ।

“তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

—“আমায়? কর!”······

দাঁড় বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

—“নন্দিতা”

বিরতি। ভীরুতা না দুঃসাহস?

—“নন্দিতা, তোমায় ভালবাসা তোমায় চাওয়া,—তোমায় কামনা করা কি পাপ?”

নিস্তব্ধ। নিঝুম। অন্ধকার।

—"বল নন্দিতা, জীবনে কি তুমি কিছু চাও না? স্বামী, ভালবাসা, গৃহ, সংসার……"

নন্দিতা নিরুত্তর।

প্রেমাঙ্কুর বলে চলে "নন্দিতা, নন্দিতা……!"

নন্দিতা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। প্রেমাঙ্কুরের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস থেকে থেকে নন্দিতার গালের ঠিক ওপরে পড়ছে। বাতাসের গায়ে অগ্নিশিখা যেমন থেকে ঝলকে ওঠে। প্রেমাঙ্কুরের নিশ্বাসে অব্যক্ত ভালবাসা; কামনা; দাবী।

প্রেমাঙ্কুর বলে—"জীবনে এমন করে কোনদিন কাউকে চাইনি নন্দিতা—অবিমিশ্র ভাবে, সম্পূর্ণ নিজের করে। আমার সমস্ত অনু পরমাণু দিয়ে।

কথাগুলো এলোমেলো; অসংযত; কিন্তু স্পষ্ট।

অন্ধকার যেন নন্দিতাকে গ্রাস করবে। রাত্রির নির্জনতা যেন বিরাটাকার দৈত্যের রূপ নিয়ে নন্দিতার দিকে ছুটে আসছে। ও আজ নিঃস্ব। সম্পূর্ণ একা।

ভীরু কপোতের মতন কাঁপছে।

নন্দিতার মনে হল এত বড় পৃথিবীতে ও আজ একটি কণা মাত্র। বিরাট সমুদ্রের বুকে যেন একটি ফোঁটা।

"আমার বড্ড ভয় করছে প্রেমাঙ্কুর।"

নিজেকে ও সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে প্রেমাঙ্কুরের কাছে। ওর ভাষা অস্পষ্ট। কথা হারিয়ে গেছে।

অন্ধকার।

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার।

দূরে ভেসে চলেছে এক সার নৌকো।

ঝপ্। ঝপ্। ঝপ্।

অস্পষ্ট ভেসে আসছে দাঁড়টানার শব্দ।

যাত্রী—নারী আর পুরুষ।

প্রকৃতির বুকে তারা ভেসে চলেছে।

অবুঝ শিশুর দল।

আজ প্রকৃতির হাতে মানুষের পরাজয়……

ধীরে ধীরে নদীর বাঁকে আলোর কণাগুলো মিলিয়ে গেল একটির পর একটি।

অন্ধকার পৃথিবী অন্ধকারেই এগিয়ে চল্‌ল।

গভীর রাত্রে নন্দিতা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—

এই কি আরম্ভ ; না এই শেষ ?

কে জানে ?……

৫

চার মাস পর।

ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় টাউন পূর্ণ উদ্যমে ছুটে চলেছে সাধনার জোয়ার বুকে করে। প্রার্থনা ; স্কুল ; কলেজ ; লেকচার ; পরীক্ষা, সমতালে ছুটে চলেছে একটির পর একটি।

বিরাম নেই ; বিশ্রাম নেই।

ছাত্র ছাত্রীদের কলরোলে টাউনটি গম গম করছে ; জমাট-বাঁধা বিরাট চাঞ্চল্য ; যেন পূর্ণ যৌবনা।

বিকেল বেলা।

ল্যাবরেটরিতে ছাত্র ছাত্রীরা কাজ করছে, তার চেয়ে বেশী করছে গোলমাল। নন্দিতা কি একটা experiment করছিল বার্ণার জ্বেলে। তার ঠিক পাশে প্রেমাঙ্কুর।

আজকাল প্রেমাঙ্কুর যেন কেমন হয়ে গেছে। তেমন আর অস্থির ভাবে নন্দিতার দিকে চেয়ে থাকে না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সময় অসময় নন্দিতার কাছে ছুটে যায় না। ওকে এড়িয়ে যেতে চায়। ওর চোখের দিকে চাইবার সাহসও বুঝি প্রেমাঙ্কুরের নেই। মেজাজও রুক্ষ। নন্দিতার কোন কথার জবাব দিতে চায় না। বিরক্ত মনে হয়। রাগ করে। অসংযত উত্তর দেয়। আঘাত করে।

চিরাচরিত পুরুষ। যা পায় না তার জন্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পেলেই তার প্রয়োজন যায় ফুরিয়ে, তার পর লাথি মেরে ধূলোয় ফেলে দেয়।

নারী যুগ যুগ ধরে এমনি করে তার কাছে হয়েছে লাঞ্ছিত; অবমানিত। সভ্যতা পারেনি পুরুষের এ মনোভাব বদলাতে। শিক্ষা পারেনি তাকে আদিম বর্বরতার গণ্ডী থেকে ছাড়িয়ে আনতে।

পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নারী। এমনি ধারা প্রেমাঙ্কুর এমনি ধারা নন্দিতাকে পথে টেনে এনেছে সংসার থেকে তার পর ঠেলে ফেলে দিয়েছে অবহেলা অশ্রদ্ধা আর অবমাননার অন্ধকার নোংরা গলির মধ্যে। সেখানে গিয়েও নারী পুরুষের জন্যেই নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করেছে। বদলে পুরুষ দিয়েছে কলঙ্কের বোঝা। পুরুষের সমাজ তাকে দিয়েছে পাপের পুঁটুলি। নারী হাসিমুখে তাই নিয়েছে।

নন্দিতা প্রতিমুহূর্তে প্রেমাঙ্কুরকে চায়। তার অবহেলা নন্দিতাকে দূরে সরায় না, আরও কাছে টেনে নিয়ে যায়। তার অসংযত কথা নন্দিতাকে বেদনা দেয়। নন্দিতা অভিমান করে। সে শুধু ক্ষণিকের জন্যে। আবার তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সে যে মাতৃমূর্তি।

নন্দিতা আপন মনে কাজ করছিল।

ওধারের কোণের টেবিলে কথা হচ্ছিল অভিজিৎ আর অমিতার মধ্যে। "ডাক্তার চৌধুরী আজকাল প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন।"

"চিরদিনই তিনি এমনি ধারা, কিন্তু আজকাল যেন একটু বেশী।"

অভিজিৎ এসিডটা নাড়তে নাড়তে বল্লে—"ডাঃ চৌধুরীর আজকাল কি হয়েছে বল ত?"

"কি জানি!"

—"কোন দিন না তিনি য়্যাকসিডেণ্ট করে সমস্ত ল্যাবটা উড়িয়ে দেন, কাজে যা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন!"

—"কাল প্রায় তাই হয়েছিল আর কি। মারকারি ভেপারের টিউবটা ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে ভেঙেই ফেললেন।"

ছোট ছোট কথা; কিন্তু সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। নন্দিতা অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। ভাসা ভাসা কয়েকটা কথা। মাঝে মাঝে। বেশীর ভাগ কথাই কোলাহলে হারিয়ে যাচ্ছিল।

ওর অজান্তেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

—"ভদ্রলোকের জন্যে মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

—"পাগল না হ'য়ে যান।"

—"দিনকে দিন কি রকম ফুলছেন দেখছিস ?"

—"পাগল হবার পূর্ব্ব লক্ষণ !"

ও পাশ থেকে সমর এবার যোগ দিল। পরনিন্দা পরচর্চা ওর মজ্জাগত। পরের ব্যাপার ছেড়ে নিজের কাজে মন দেওয়া ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। ডেলি প্যাসেন্‌জারি করা বড়বাবুর গৃহিণীর মতন ওর স্বভাব। ছেলেটি শিক্ষিত ; পিতৃদেব কয়লার খনির ম্যানেজার। রসাল আলোচনা হচ্ছে শুনে কাজ ছেড়ে অসিতের টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। উপযাচক হ'য়ে বল্লে "আমি জানি।" তার পর গলাটা খাট করে বল্লে "নারী সংক্রান্ত ব্যাপার !"

"কি রকম ? কি রকম ?"

সবাই এবার ওর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ কাজের চেয়ে মুখরোচক একটা কিছু পাওয়া গেছে।

নন্দিতা নিজের যায়গায় দাঁড়িয়ে। স্তম্ভিত। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। কে যেন ওর গলা চেপে ধরেচে।

চোখের সামনে বিকৃত কয়েকটা মূর্তি হুড়োহুড়ি করছে।

সমর তখন রং ফলিয়ে বর্ণনা করছে—

"কণিকা দেবী রে ; ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রী। জানিস ত তিনি একটা ডানাকাটা পরী, রোজ কাপড় জামার সঙ্গে ম্যাচ করে প্রেমিক বদলান। সম্প্রতি তিনি রতিনবাবুকে আঁকড়ে ধরেছেন, বিয়ের আংটির মতন।"

—"বাগে পেয়ে আঙ্গুলটা ফুলে উঠছে আর আংটিটা জমে বসছে।"

—"জমজমাটি ব্যাপার।"

সবাই হেসে উঠল। ক্রূর ব্যঙ্গ।

নন্দিতার কানে এসে বিঁধল যেন বিষ মাখান এক নতুন তীর। হাত দুটি ওর কাঁপতে লাগল। পা দুটি যেন অবশ। মাথা ঘুরছে। ল্যাবটা যেন কুয়াসার মতন আবছায়া। দৃষ্টিশক্তি ওর ক্রমেই ঝাপ্সা হয়ে আসছে। একদল বিরাটাকার দৈত্য ওর চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করল। কানে ভেসে এল সমস্ত পৃথিবীর সমবেত চীৎকার।

হাতের টেষ্ট টিউব দুটো প'ড়ে গেল।

টেবিলের ওপর ও ঝুঁকে পড়ল।

সংজ্ঞাহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল।

চীৎকার। গোলমাল। হুড়োহুড়ি।

অকারণ ব্যস্ততা।

"জল।" "বাতাস"। "সরে যাও!"……

প্রেমাঙ্কুর ওকে কোলে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। ফ্যানটা জোরে চালিয়ে দিয়ে কলের তলায় মাথাটা ধরল।

ডাঃ চৌধুরী গোলমালে ছুটে এলেন।

নন্দিতা তখন উঠে বসেছে।

ছেলেমেয়ের দল যে যার কাজে চলে গেল। সমর ল্যাবে ফিরে যাবার সময় অসিতের কানে কানে বল্লে "হিষ্টিরিয়া!—এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না দিলে মেয়েদের এরকম হয়!"

কুৎসিত ইঙ্গিত।

নন্দিতা এখনও ভাবছে কি হয়েছে।

অব্যক্ত লজ্জা; শঙ্কা; দ্বিধা ওর চাউনিতে। যেন কত বড় অপরাধি!

ডাঃ চৌধুরী বল্লেন " এ সব ব্যাপার কবে থেকে আরম্ভ হ'ল?"

নন্দিতা সত্যিই অপ্রস্তুতে পড়েছে। ক্ষমা চেয়ে নেবার মতন সাহসও ওর নেই। জড়িত কণ্ঠে বল্লে আমি, আমি বিশেষ দুঃখিত।

—"কোন গ্যাস নাকে যায় নি ত?"

—"না।"

—"এখন কেমন বোধ হচ্ছে।"

—"ভাল"

নন্দিতা পালাতে পারলে বাঁচে। ডাঃ চৌধুরীর উপস্থিতি যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। যত ভাবছে ততই যেন লজ্জা ওর গলা টিপে ধরছে। নন্দিতা উঠে পাশের ঘরে যাচ্ছিল। ডাঃ চৌধুরী বাধা দিয়ে বল্লেন—

—"কোথায় যাচ্ছ? কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। তারপর হোষ্টেলে ফিরে যাও। আজ যেন আর তোমায় ল্যাবে দেখতে না পাই। কাজ কাজ করে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করবে দেখছি। অতিরিক্ত কাজ করা আমি পছন্দ করি না।"

ডাঃ চৌধুরী ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। চৌকাটে দাঁড়িয়ে বল্লেন—

—"একলা যেতে পারবে ত?"

—"পারব।"

ডাঃ চৌধুরী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

ওভার অল ছেড়ে নন্দিতা পথে এসে দাঁড়াল। সব যেন এলোমেলো। পৃথিবী যেন এলোমেলো ঘুরছে। অন্ধকারের বুক চীরে ওর দিকে ছুটে আসছে হাজার হাজার দৈত্য।

নন্দিতা মাতালের মতন টলতে টলতে চলেছে। রাস্তা ত নয় যেন পর্বতমালা। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। পথে দু একজন প্রবীণ ছাত্র। সবাই যেন হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে আছে। লাইব্রেরী বাড়ীটা পর্য্যন্ত যেন প্রেতাত্মার মতন ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখের সামনে একি দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

এ কি বিভীষিকা!

রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠেছে। আলোর মালা পরে টাউনটি যেন অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। নির্জনতা আরও নিবিড় হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসে ছেলেমেয়েদের ভাঙা কলরব। মিলনায়তন যেন নিঝুম পুরী, সমস্ত পৃথিবীটা যেন শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার।

নন্দিতা আজ উন্মাদ।

সামান্য বাতাসকে মনে হয় যেন প্রবল ঘূর্ণী।

একটুখানি শব্দ যেন চীৎকার।

একরকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই নন্দিতা হোষ্টেলে ঢুকে পড়ল। সবাই তখন ঘরে ঘরে আড্ডা জমিয়েছে।

যাক্, বাসন্তী ঘরে নেই, নন্দিতা যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল শঙ্কাহীনের মতন।

"না! না! এ হতে পারে না, হতে পারে না।"

নন্দিতা ছেলেমানুষের মতন কেঁদে উঠল। আজও প্রথমে নিজেকে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলেছে। যেদিন সবাই ওকে বল্লে ওর মা বেড়াতে গেছেন আর ফিরবেন না, সেদিনও এমনভাবে ও কাঁদেনি। বাবা যখন মারা যান তখন তাঁকে হারাবার ব্যথা ওকে এমন ভাবে বিচলিত করে নি! কাঁদলেই যদি তাঁকে ফিরে পাওয়া যেত তাহলে হয়ত পৃথিবী শুদ্ধ লোকের জন্যেই ও কাঁদতে পারত, কিন্তু সে যে অসম্ভব। ও বোঝে, ও জানে। মৃত্যু একদিন সকলকেই এমনি করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। বন্ধু,

বাপ, মা, স্বামীপুত্র সবাইকে। মৃত্যু অনুনয় বিনয়, কাকুতি মিনতি কিচ্ছু শোনে না; তার কাছে কাঁদা মানে পরাজয় স্বীকার করে দুঃখের কাছে দাসত্ব মেনে নেওয়া; শোকের শৃঙ্খল পরা।

মনকে এই সব কথা বুঝিয়ে ও কান্নাকে জয় করেছিল। শোককে দমন করেছিল। তাতে পেয়েছিল আত্মতৃপ্তি; আনন্দ। কিন্তু আজ?

আজ সে কি বোঝাবে? আজ কি যুক্তি দিয়ে মনকে দমন করবে? পাপ পুণ্য কিছু নয়? ন্যায় অন্যায় মানুষের ধারণা মাত্র? সামাজিক রীতি নীতি মানুষ যেমন নিজে হাতে গড়েছে, তেমনি স্বচ্ছন্দে সে ভাঙতেও পারে?

এসব ত' আধুনিক সাহিত্যের বিকার। তর্কের খাতিরে নাটক নভেলের মনগড়া নায়ক নায়িকাকে দিয়ে যে সব কথা বলানো চলে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তা অচল। অবান্তর।

কাল যখন সমস্ত পৃথিবী কলঙ্কের বোঝা ওর মাথায় চাপিয়ে দেবে তখন ও কি বলবে?

বলবে, যৌবনের আবর্তে যুগ যুগান্তরের প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ করা কি অন্যায়? তাহলে সমাজ হাসবে, বলবে পাগল!

বলবে, নিয়তি, ভাগ্য!

সমাজ তা মানে না, বোঝে না।

বলবে, পুরুষের চক্রান্ত, প্রলোভন!

সেও অচল। পুরুষের দোষ গুণ সমাজ চিরদিন ক্ষমা করে। সামাজিক আইন-কানুন পুরুষের জন্যে নয়, নারীর জন্যে।

পুরুষের চরিত্র যেন সাহারার মরুভূমি, যেদিক দিয়ে ইচ্ছে পথ করে নেওয়া যায়; পদচিহ্ন পড়ে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে, মুহূর্ত পরে আবার তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

নারীর চরিত্র যেন কাঁচের টুকরো, একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। দাগ চিরকালের জন্যে থেকে যায়। সমাজ সেই দাগটাকে বলে কলঙ্ক।

বলবে ক্ষণিকের দুর্বলতা? মোহ? ভুল?

নারীকে দেবীর স্থানে রেখে পুরুষ পূজো করে। তার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমার অতীত!

কেন কাঁদছে নন্দিতা ?

কেঁদে কি সে বিপদটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে ? নারীর কাতরোক্তি একজন পুরুষকেই টলাতে পারে না, পুরুষের সমষ্টি সমাজ ত দূরের কথা।

নন্দিতা কান্না থামিয়ে বিছানার ওপর বসল।

চিন্তার সূত্র ধরে একটির পর একটি কথা ওকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল।

বাসন্তী কি ভাববে ? ওকে ঘৃণা করবে, না সহানুভূতি দিয়ে ঘিরে রাখবে ?

হয় ত বলবে মরাই এর চেয়ে ছিল ভাল !

—কিন্তু সত্যিই কি এটা অপরাধ ?

—আর প্রেমাঙ্কুর !—সে ত পুরুষ, আজ দোষ করেছে, কাল ভুলে যাবে।

কণিকা !

মনে পড়ে গেল প্রথম যেদিন ও বাড়ী ফিরছিল বাবাকে চির-নিদ্রায় শুইয়ে দিয়ে।

—একা, সম্পূর্ণ একা।

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী।

—তোমাদের সব চাইতে বেশী দরকার জীবনের প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া।

"ডাঃ চৌধুরী কি বলবেন ?"

আর বিশ্ববিদ্যালয় ?

কাল যখন ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে কথাটা ঘুরবে টাউনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত, তখন ?

ছেলের দল চায়ের দোকানে আসর জমাবে, চা আর সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কুৎসা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে টাউনের পথে ঘাটে······ছেলের দল ওকে দেখিয়ে বলবে, "ঐ।" মেয়েরা মুখে আঁচল চেপে হাসবে······

আচ্ছা এটা সত্যি কি ক্ষমতাতীত অপরাধ ?

প্রলোভন ?

দুর্ব্বলতা ?

কেন নন্দিতা অমন ভাবে সেদিন নিজেকে ভুলে গেল ? ভুলে গেল ন্যায়, অন্যায়, পাপ পুণ্য, সমাজ, কলঙ্ক।

ভুলে গেল তাদের—যাদের ভালবাসা, স্নেহ, মায়া মমতা সব হারিয়ে গেছে পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তির অন্তরালে।

সমাজ যাদের বলে পতিতা।

যাদের সকলের জীবনের অপরিসীম দুঃখের ইতিহাসের ভিত্তি এমনি একটি ছোট ঘটনা।

নন্দিতার মনে হল চীৎকার করে সবাইকে বলে "মাতৃত্ব পাপ নয়—মাতৃত্বই নারীর পরিপূর্ণতা।"

—কিন্তু পারল না। কণ্ঠ ওর বন্ধ হয়ে গেছে।

অনুতাপে ? ভয়ে ? ভাবনায় ? না লজ্জায় ?

এত' ভাবনা চিন্তার পরও কোন কূল কিনারা নন্দিতা পেল না। সমস্ত ভাবনা ছাপিয়ে উঠল একটি কথা,—

"না, না, এ অসম্ভব—এ হ'তে পারে না"

প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক মিনিটে, প্রত্যেক কথায়—সেই এক কথা ওর বার বার মনে হতে লাগল।

"অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব !"

ভূতের ভয় মানুষ এড়িয়ে রাখতে পারে, দুঃখকে মানুষ ভুলতে পারে। কিন্তু যেটা বাস্তব, যেটা সত্যি, যেটা মিথ্যা নয় তাকে কিছুতেই মানুষ এড়াতে পারে না ! অবোধ শিশুর মতন কাঁদতে পারে, চীৎকার করে পৃথিবী ফাটিয়ে দিতে পারে, অনুনয় করে পাষাণ গলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তবু বাস্তব চিরকালই বাস্তব, তাকে এড়িয়ে যেতে মানুষ পারে না।

দর্শন তত্ত্ব আলোচনাতে তর্ক চলে, বিজ্ঞানে চলে না।

নন্দিতা জানে কেন আজ সে অমন ভাবে পড়ে গিয়েছিল। ডাঃ চৌধুরীর নিন্দায় নয় ; তাঁর দুঃখে নয় ; অতিরিক্ত কাজ করার জন্যে নয়।

মাতৃত্বের প্রথম বিকাশে। চার মাস আগে বসন্ত উৎসবের দিন যৌবন, প্রকৃতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নারী আর পুরুষকে নিয়ে যে খেলা খেলেছিল, আজ তারই প্রথম বিকাশ।

প্রথম প্রেমের প্রথম মুকুল।

প্রেমাঙ্কুর কি এর জন্যে দায়ী ?

না। নন্দিতা যদি পাষাণের মতন শক্ত হত, প্রেমাঙ্কুর তার কি করতে পারত!

প্রেমোঙ্কুর নির্দোষ। কিন্তু সে নিজেই কি দোষী ?

নন্দিতা যেন শুনতে পেল, পৃথিবী শুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে বলছে "হ্যাঁ।"

কে দায়ী ?

সিঁড়িতে কার পদশব্দ।

ওর মনে সেই পদশব্দ এসে আঘাত করল হাতুড়ির মতন।

কে আসছে কে জানে ?

নন্দিতা শাড়ীর আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

তাতেও ওর ভয় গেল না। তাড়াতাড়ি চাদরটা টেনে গায়ে দিল।

ঘরে ঢুকল বাসন্তী।

তবু ভাল। নন্দিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাসন্তী আপন মনে গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল। আলোটা জ্বেলে ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠল।

নন্দিতা যে অন্ধকারে অমন করে চাদর গায় দিয়ে বসে থাকবে, ও ভাবতেও পারে নি।

নন্দিতা ওর দিকে চেয়েছিল একদৃষ্টে।

সে দৃষ্টিতে সন্দেহ, লজ্জা, ভয়, বেদনা।

বাসন্তী ওর কপালে হাত দিয়ে বল্লে "জ্বর হয়নি ত ? চেহারাটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে। আজ রাত্রে আর কিছু খেয়ে কাজ নেই, মুখ চোখ সব ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

নন্দিতা নিরুত্তর। কাঁপছে।

বাসন্তী আপন মনেই বলে চল্লো "কতবার তোকে বারন করেছি—নন্দিতা, অমনভাবে প্রাণপণ পরিশ্রম করলে শরীর টিকবে না। তা আমার কথা কি তুই শুনবি।"

তারপর থেমে আবার বলতে আরম্ভ করে "মাথার ওপর দেখবার কেউ নেই কিনা তাই জেনে শুনেও বিপদ টেনে আনিস্; এখন যদি শক্ত একটা কিছু হয় তা হ'লে দেখবে কে বল তো ? এমনি করে কেন নিজের ধ্বংস টেনে আনা নন্দিতা ?"

সত্যি কথা। বাসন্তী নন্দিতাকে অত্যধিক ভালবাসে। অনেকবার অনেক রকম ভাবে বাসন্তী নন্দিতাকে একথা বলেছে, ওর রাত জেগে পড়াতে স্নেহভরা রাগে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নন্দিতা শোনেনি।

বাসন্তী রাগ করেছে, দুঃখ করেছে, অভিমান করেছে। নন্দিতা তবু শোনেনি। তাই আজ পুঞ্জীভূত অভিমানে বাসন্তী অনেক্ কথা বলে চলেছে। একটির পর একটি ; যেন রুদ্ধ অশ্রুধারা নিজেকে প্রকাশ করছে। কোন বাধা কোন শক্তি আজ তাকে আটকাতে পারবে না।

বাসন্তী বল্লে "আজ আর পড়তে হবে না। গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়।" বলে দুধ আনতে নিচে নেমে গেল। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

নন্দিতা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ভয়ানক দুর্ব্বল। শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। বইগুলো গুছিয়ে তুলে রাখবে শাড়িটা ছেড়ে ফেলবে।

অনুজ্জ্বল আলোতে দৃষ্টি পড়ল ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার ওপর। ওর নিজের প্রতিমূত্তি। একি বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি? নিজেকে ও নিজেই চিনতে পারল না। একি নন্দিতা, না ওর বিভৎস প্রেতমূত্তি? কাল যা ছিল স্বচ্ছ সরল, আজ তা হয়ে উঠেছে বিকৃত, বিকলাঙ্গ, বিশ্রী।

সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দিতা নিজের প্রতিমূত্তির দিকে চেয়ে রইল। এমন-ভাবে সে কোনদিনও নিজেকে দেখেনি।

কি চেহারা হয়েছে। রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। দৃষ্টিতে দুর্ব্বলতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিথিলতা।

আর ?······

নন্দিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নিজেকে আরও খুঁটিয়ে দেখবার মতন সাহস ওর নেই। উগ্রমূত্তি কঠিন বাস্তব ওকে তা হ'লে গ্রাস করবে।

মাথাটা ওর ঘুরে গেল। পা দুটো যেন অবশ। বিছানায় ফিরে আসবার ক্ষমতাও যেন ওর নেই। পাশের চেয়ারটায় ও বসে পড়ল।

মুখ দিয়ে অস্পষ্ট বেরিয়ে এল—"ভগবান!" জীবনের শেষ আশ্রয়, চরম সত্য।

বাসন্তী ঘরে ঢুকল, এক কাপ দুধ হাতে করে। ······

নন্দিতা তখন টেবিলে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মতন কাঁদছে।

বাসন্তী সস্নেহে ওর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লে—

“ছি নন্দিতা, এমনভাবে কি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে আছে। অসুখ কি মানুষের করে না ?”

সাহসের দরকার, সগর্ব্বে বিপদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোই ত' জীবন।

নন্দিতা এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অসহায়, নিঃস্ব, আপনহারা বালিকা।

বাসন্তী আজ জানে না, তাই সহানুভূতি প্রকাশ করছে, কাল যখন জানবে তখন ওকে ঘৃণা করবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। অবহেলায়, ঘৃণায়, অপমানে মুখ ফিরিয়ে নেবে, বলবে “চরিত্রহীনা, সমাজের কলঙ্ক।”

একথা একবারও ভাববে না যে এ দুর্বলতা চিরন্তন; ওরও হতে পারে, যে কোন দিন যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্তে। কোন আয়োজনের দরকার হবে না, কোন সময় সুযোগের দরকার হবে না। প্রকৃতির গতিতে আপনিই হতে পারে।

নন্দিতাকে ধরে বাসন্তী বিছানায় শুইয়ে দিলে। আলোটা নিবিয়ে দিলে। আজ পূর্ণিমা; এক ঝলক চাঁদের আলো ওর বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। অস্পষ্ট আলোতে সব দেখায় আবছায়া, ঝাপ্‌সা, কৌতূহলের আবরণে লুকানো। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে নন্দিতা নিশ্চিন্ত। পাপের গতিই তাই।

নিশ্চুপে বসে বাসন্তী নন্দিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জানলার বাইরে দিয়ে ওর দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। দিক-দিগন্ত ভেদ করে ওর দৃষ্টি চলে গেছে অন্ধকার ভেদ করে বহুদূরে; তারাদলের মাঝখানে যেন ওর মন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চোখ দুটি ওর যেন জলে ভরা।

নন্দিতা ভয় পেল। বাসন্তী কি ভাবছে ?

তবে কি ?......

নন্দিতা চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনমতেই আজ ও বাসন্তীকে ভাববার

সময় দেবে না। যদি ওর কথা ভাবে, যদি ভাবনার শেষ সীমানায় গিয়ে বাস্তবকে খুঁজে পায়।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করে "কি ভাবছিস অমন করে?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাসন্তী দৃষ্টি নামালো। মৃদু হাসলে, বল্লে—"কিছু না, এমনি।"

নন্দিতা অস্থির; বাসন্তী নিশ্চয় ওকে এড়িয়ে যেতে চায়।

বল্লে "তবু!"

—"ভাবছি তোর মতন মেয়ে কি করে নিজেকে অমন ছেলেমানুষের মতন হারিয়ে ফেললি। সত্যি, দুর্বল মুহূর্তে মানুষের কত কি যে হয়ে যায়; স্থবির পাষাণও বোধ হয় এক এক সময় তার দুর্বল মুহূর্তে কাঁদে। জীবনের কাছে পরাজয় মেনে নেয়।

নন্দিতা ভীরু কপোতের মতন কাঁপছে। বাসন্তী কি দিনের নগ্ন আলোতে ওকে বিশ্লেষণ করছে?

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে "এ কি গরম লাগছে নাকি, তুই যে দেখছি ঘেমে উঠছিস্, চাদরটা সরিয়ে রাখি।"

প্রবল বাধা দিয়ে নন্দিতা বাসন্তীর হাতটা সরিয়ে দেয়।

না। না! না!

কারো সঙ্গ আর নন্দিতার ভাল লাগে না। ভয়, সন্দেহ, সঙ্কোচ, কলঙ্ক।

বল্লে "বাসন্তি, রাত হোল খেয়ে আয়।"

বাসন্তী উঠে গেল।

নিশুতি রাত্রি। নিবিড়, নির্ঝুম। কোন গোলমাল নেই, কোলাহল নেই। নিশাচর পাখীরা পর্য্যন্ত আজ নীরব। নিস্তব্ধ পৃথিবী যেন কার অপেক্ষায়। ঝড় উঠবে নাকি?

নন্দিতা সাহসে বুক বাঁধল। মনে মনে স্থির করলে পরাজয় ও কিছুতেই মেনে নেবে না। মাথা তুলে দাঁড়াবে, শেষ পর্য্যন্ত যুঝবে। মুহূর্তের দুর্বলতায় যে আকস্মিক বিপদ ওর মাথার ওপরে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে তাকে ও সমূলে ধ্বংস করবে। হোক ও একা, হোক ও সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তবু ও শেষ দেখবে। দরকার হলে সমস্ত উপেক্ষা করবে, সমাজ, সংসার, নিন্দা, ভয়, কলঙ্ক।

যেমনি নিশ্চুপে অথচ নিশ্চিত ভাবে ক্ষণিকের মোহ ওকে গ্রাস করেছে, তেমনি ভাবে নন্দিতাও বিপদকে গ্রাস করবে!

কলেজের ছাত্রী নন্দিতা, যুবতী নন্দিতা, পৃথিবীর মেয়ে নন্দিতা আজ বদ্ধ পরিকর—শেষ চেষ্টা করতে হবে। সভ্যতার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও নিজেকে বাঁচাবে। নিজের ডাক্তারী বিদ্যাকে ও কাজে লাগাবে। হ'ক অন্যায়, হ'ক পাপ, তবু।

এই ত সভ্যতার আসল পরিচয়। এমনি করেই ত বিজ্ঞান প্রসার লাভ করেছে। আধুনিক যুগে যে বিদ্যা মৃত্যুকে এগিয়ে আনতে না পারল, সে বিদ্যার মূল্য কি?

নিশ্চিত মারণাস্ত্র যে জ্ঞান সেইটাই ত সভ্যতার মাপকাটিতে অগ্রগতি।

আজ নন্দিতা অটল।

কিন্তু আর এক নন্দিতা মাথা তুলে দাঁড়াল। ধীরে, ধীরে, সুনিশ্চিত ভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রীর নন্দিতার অজান্তে।

সে নন্দিতা যুবতী নয়। মাতৃমূর্ত্তি; মা।

দ্বন্দ্ব; কলহ;

কে জিতবে?

বাসন্তী ফিরে এসে দেখল নন্দিতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ আলো ওকে যেন চুম্বন করছে। সেই অনুজ্জ্বল আলোতে বাসন্তী নন্দিতার চেহারা দেখে চমকে উঠল।

দ্বন্দ্বের পরিস্ফুট আভাষ। অশুভ সংগ্রামের করাল ছায়া ঝড়ের আগে প্রকৃতির যেন থম্‌থমে রূপ, তারই স্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

চাদরটা টেনে দিল।

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। সস্নেহে; সহানুভূতিতে।

আর্দ্রকণ্ঠে বল্লে "বেচারী।"

অদূরে একটা পেঁচা বিকট চীৎকার করে উড়ে গেল। নির্জন রাত্রের গহ্বরে সে বিকট চীৎকার প্রতিধ্বনিত হল। বিপদের কঙ্কালময়

মূর্তি যেন সশব্দে হেসে উঠল—অট্টহাস্য। বিভীষিকা যেন মাথা তুলে দাঁড়াল।

ঘুমের ঘোরে নন্দিতা পাশ ফিরলো। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট বেরিয়ে এল' "ভগবান!"

বাসন্তী একদৃষ্টে চেয়েছিল নন্দিতার দিকে। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, নন্দিতার কপালের ঠিক ওপরটায়।

নিয়তি হয়ত হাসল। শুধু দুফোঁটা জল। সমুদ্রের যেখানে প্রয়োজন জলবিন্দু সেখানে কতটুকু।

৬

নন্দিতার দিন যেন হুহু করে চলেছে।

নন্দিতা দুহাত দিয়েও আর ধরে রাখতে পারছে না। শব্দ শুনলেই ও চমকে উঠে। হৃদয়ের ধক্ ধক্ শব্দ যেন মনে হয় বিভিষিকার পদ চালনা। ভয়ে নন্দিতা সব সময়ই তটস্থ। খাওয়া ভুলে গেল, লেখাপড়ায় মন নেই, বেশী চলা ফেরা করতে ইচ্ছে করে না।

ক্রমশই ও যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। দিনরাত শুধু চিন্তা, ভয়, আশঙ্কা।...কোথায় গিয়ে, কেমন করে শেষ হবে ওর এই জীবন।

প্রত্যেক মুহূর্তে ও উপলব্ধি করে নতুন মানুষের আগমনী। ওর দেহ, মনকে কেন্দ্র করে সে বড় হচ্ছে। ধীরে, শান্ত ভাবে, ওর একান্ত অজান্তেই, সুনিশ্চিত ভাবে।

মাঝে মাঝে ওর মাতৃত্ব মাথা তুলে দাঁড়ায়, কুমারী নন্দিতাকে বলে—"যে আসছে তাকে আসতে দাও; সে তোমার সন্তান, তুমি তার মা। তোমার প্রতি অণু পরমাণুকে কেন্দ্র করে তার জীবন, তোমার প্রতিরক্ত বিন্দু তার ধমনীতে ধমনীতে; তোমার—আর বলতে পারে না, কুমারী নন্দিতা তার গলা চেপে ধরে, ক্ষিপ্তের মতন চীৎকার করে বলে—

"চুপ কর, চুপ কর! দেখতে পাচ্ছনা মানুষের সমাজ, কলঙ্কের

বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? শুনতে পারছ না চীৎকার করে বলছে—'পাপ, অন্যায়, কলঙ্ক—"

সবার ওপরে দেখতে পায়: সরু গলি, অন্ধকার, নোংরা, দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বিকৃত, বিশ্রী নারীর দল। রূপের হাটে যাদের বেসাতি। পতিতা!

নন্দিতার মাতৃত্ব পরাজিত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

আর সময় নষ্ট করা যায় না। নিজের বিদ্যায় কোন ফল নন্দিতা পেল না।

সেদিন ক্লাস শেষ করে নন্দিতা পা বাড়াল বইয়ের দোকানের উদ্দেশে।

ত্রস্ত; চঞ্চল; ক্ষিপ্ত।

ফিরে ফিরে সভয়ে দেখে, কেউ দেখতে পাচ্ছে কিনা। মনে ওর ভয়, যদি কেউ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করে! যদি কেউ সন্দেহ করে! লোকের চোখ এড়িয়ে নন্দিতা নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু পারে কই? স্বাভাবিক ভাবে ও হাঁটতে চায়, কিন্তু পারে না।

মনে ওর গভীর আশঙ্কা; হৃদয়ে উদ্বেগ।

সব সময় ওর চলাফেরার একটা অস্বাভাবিক জড়তা। নিজেকে সামলে নেবার অযথা চেষ্টা, কারণে, অকারণে।

শাড়ীগুলো যেন হঠাৎ খুব ছোট হয়ে গেছে, ভাল করে পরা যায় না।

ছোট্ট অন্ধকার বয়ের দোকান। গুদম করা বই, নতুন, পুরোনো, সব রকম। প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞান, ডাক্তারী।

একটা অদ্ভুত গন্ধ। ছাপাখানার সঙ্গে পুরোনো বয়ের গন্ধ মেশান।

বয়ের দোকানের মালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র, নাম সমরেশ। ছেলেটি খুব কৃতি ছাত্র ছিল, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ডান হাত ভেঙে যায়; অ্যাম্পুট করতে হয়। দীর্ঘ কৃশকায় ছেলেটি। খুব মার্জিত ব্যবহার, শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য। অত্যধিক নম্র, ব্যবসার খাতিরে নয়, স্বভাবতঃই। সব সময় হাসে, রাগ, দুঃখ মান অভিমান কোন কিছুই পারে না ওর সরল হাসিটি চুরি করতে। ছেলেটি 'দেখন-হাসি'।

টাউনের সকলকেই সে চেনে, শুধু চেনে নয়, জানে ও। প্রাথমিক বিভাগের নবাগত ছেলে টুনু যখন এসে দাঁড়ায়, সমরেশ তার সঙ্গে আলাপ করে সহজ শিশুর মতন, যেন তার সহপাঠি। আদর করে তাকে নানান রকম ছবির বই দেখায়, ওর সঙ্গে গল্প করে, এক পয়সায় তিনটের জায়গায় চারটে বিস্কুট দেয়, উপরন্তু আরও একটা দিয়ে বলে—"পিন্টুকে দিও, কিন্তু খবরদার নিজে খেওনা যেন!"

টুনু হাসতে হাসতে চলে যায়, হয়ত পিন্টুকে দেয়, হয়ত দেয়না, কিন্তু নিয়মিত অন্ততঃ একবার করে সমরেশদার দোকানে আসে। শুধু ওকে নয়, এমনি করে ওর মতন সবাইকে ও বশ করেছে। সমরেশদা তাই ছোটদের কাছে যাদুকর।

কিশোরের দল এলে তাদের সঙ্গেও ও তেমনি সহজ ভাবে মিশে যায়, ঠিক যেন ওদেরই দলের একজন। মোহনবাগান, এরিয়ান্স্ ব্র্যাডম্যান, নাইডু, সকলের সব খবর ওর নখাগ্রে। ১৯১৩ সালে ক্যালকাটা লিগে ক পয়েন্ট পেয়েছিল আর ব্র্যাডম্যানের রানসংখ্যা কত, সব খবর ওর জানা আছে।

কিশোরীদের মধ্যেও ও অতি পরিচিত। দিদিদের দলও ওকে ভাল ভাবে চেনে, খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলে, অযথা বাক্যালাপ করে না, ওদের সঙ্গে সমতালে হাসে, গম্ভীর হয়। এরাই যে দোকানের মস্ত বড় বিজ্ঞাপন তা সমরেশ জানে। এদের আগমনে আর পাঁচজন ছেলে আসে, দশটা বই নাড়াচাড়া করে, দুটো কেনে। ভাল ভাল বই এদেরও দেখায়, কারণ প্রত্যেক মেয়ের জন্যে বই কেনবার একজন করে ছেলে আছে।

ওর সাদাসিদে ব্যবহারের পেছনে সব সময় লুকোনো আছে ব্যবসাদারী বুদ্ধি।

খুব গোপনে, খুব সন্তর্পণে সেই বু[illegible] ও পরিচালিত করে।

নির্জনে বসে চিন্তা করে আর মাঝে মাঝে শানিয়ে নেয়।

কমলা দোকানে এলেই ও জানে বিনু আসবে। বিনু এলেই বলে "নুট হাম্‌সনের হাঙ্গার কমলা পড়েনি।"

অমনি এক কপি বিক্রী।

কমলার বই পড়া হয়, বিনুর আত্মতৃপ্তি, সমরেশের দু পয়সা রোজগার।

ও রাখে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী, মায় অধ্যাপকদের পর্যন্ত খোঁজ। ছাত্রছাত্রীরা নানান রকম আলোচনা করে, মন্তব্য প্রকাশ করে; মুখরোচক কত খবর মুখে মুখে নাচানাচি করে, সমরেশ শোনে, মিট্ মিট্ করে হাসে, কোন কথা বলে না, অযথা কৌতূহলী হয় না, ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না।

ওকে সবাই মনে করে যেন প্রাণহীন প্রাচীর।

কিন্তু আসলে ও একটি ইয়ার বুক।

এমনি করে আজ প্রায় ছ বছর ও দোকান করছে; আরও করবে অনেক দিন।

নন্দিতা দোকানে ঢুকল বিকেলের নিস্তব্ধতায়। সমরেশ তখন একলা বসে ঝিমুচ্ছিল। এ সময়টা খেলা ধূলোর সময়, কাজেই ভীড় কম। নন্দিতা দোকানে ঢুকে দেখল সমরেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

সচকিত ভাবে নন্দিতা ডাকল "সমরেশ বাবু!"

সজাগ ঘুম সমরেশের পদশব্দে তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল, অপেক্ষায় ছিল ডাকের। নিরস ব্যবসাদারির অন্তরালে কোমল স্পর্শ; হাজার হোক পুরুষ ত! তাছাড়া নন্দিতাকে ও আজ আট বছর দেখছে, খাতির করে সাধারণের চেয়ে একটু বেশীই বলতে হবে।

প্রথমতঃ অনেক দিনের পরিচয়, দ্বিতীয়তঃ এককালে ও বেশ বড় রকমের খদ্দের ছিল, তা ছাড়াও নন্দিতার মস্ত বড় কোয়ালিফিকেসান ও সুন্দরী···

সমরেশ ঘুম জড়ান দৃষ্টি দিয়ে নন্দিতাকে দেখল; মৃদু হাসল; সবিনয়ে নমস্কার জানালো, বল্লে—

"আসুন, দিনান্তে এইটুকুই অবসর, কেমন আছেন?"

—'ভাল!' ওর দৃষ্টি এড়িয়ে নন্দিতা দাঁড়িয়েছে পেন ভর্ত্তি শো কেসটার পাশ ঘেঁষে।

"কি দেব? কোন বই?"

—"না।" নন্দিতা বল্লে "এমনি একটু বেড়াতে এলাম। এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।"

কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে সলজ্জ কণ্ঠে বল্লে—"জানেনই ত সমরেশ বাবু, আমার অবস্থা, বই কেনবার

সামর্থ্য নেই। আপনিই বরং আমার কয়েকটা বই কিনলে ভাল হয়, কয়েকটা অপ্রয়োজনীয় বই আমার আছে।"

তেমনি হেসে সমরেশ বল্লে "নিশ্চয়, নিশ্চয়, পাঠিয়ে দেবেন।"

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই বেচা কেনায় বেশ পয়সা আছে। নাম লেখা থাকলে অনেকেরই বই অনেকে কিন্‌তে চায়, কোন কোন বই আবার একরকম প্রায় নিলাম হয় বল্লেও চলে। পরে Second hand বই Sweet handএর present হয়ে যায়। ভাব-বিলাসী-বাঙালী ছাত্র ছাত্রীদের ও বেশ চিনেছে।

নন্দিতা তখনও বই ঘাঁটছে। সমরেশ সহানুভূতির স্বরে বলে—"আপনার শরীর কেমন আছে আজকাল, শুনলাম নাকি সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।"

নন্দিতা চমকে উঠল। অজ্ঞান কথাটার ওপর সমরেশ অযথা জোর দিল, না!

সমরেশ তেমনি স্বাভাবিক ভাবে বলে চলেছে—"সত্যি, এত গরমে ল্যাবে কাজ করা অসম্ভব, আপনারা কি করে যে করেন তাই ভাবি মাঝে মাঝে।"

একটু থেমে নন্দিতাকে আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে। অন্ধকারে বেড়ালের মতন জ্বল্ জ্বল্ করে ওর চোখ, কানা ঘুসো জল্পনা কল্পনা যে চলেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ। তীব্র আলোর দিকে চাইলে চোখ যেমন ছোট হয়ে যায়, নন্দিতা ওর দৃষ্টির তীক্ষ্নতায় তেমনি হয়ে গেছে।

সমরেশ বলে—"আপনার শরীর দেখছি ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে।"

নন্দিতা সচকিত হয়ে জবাব দেয়—

"তাই নাকি? হবে হয় ত'—। চিন্তা, সামনে পরীক্ষা কিনা",—

কথায় ওর অস্বাভাবিক জড়তা। দোষী হাতে হাতে ধরা পড়লে যেমন হয়ে যায়, তেমনি।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করে "প্রেমাঙ্কুর বাবু কেমন আছেন, আজকাল প্রায়ই তাঁকে দেখি না!"

নন্দিতা এবার সত্যি বিপদগ্রস্ত। সমরেশ কি বলতে চায়? এমন ভাবে থেকে থেকে গোপনে ইঙ্গিত করার চাইতে স্পষ্ট বললেই পারে ও

কি জানতে চায়। জানা-অজানার মাঝখানে দোল খাওয়ার চাইতে সে ঢের ভাল। নিজেকে সামলে নিয়ে নন্দিতা বলে—

"প্রেমাঙ্কুর বাবু,···ভালই আছেন।"

নন্দিতা সাহসে বুক বাঁধে, পালালে চলবে না, কার্য্যসিদ্ধি করতে যেমন করেই হোক।

বল্লে—"সমরেশ বাবু, আপনার লেডিজ লাইব্রেরীটা ঘুরে দেখতে চাই, একবার midwiferyর বই দেখব দু একখানা বিশেষ দরকার।"

সমরেশ স্মিত হাস্যে বলে—"midwifery! হ্যাঁ, অনেক বই আছে ভেতরে যান।"

ইতিমধ্যে দোকানে ঢুকল একটি প্রবীণ ছাত্র। সমরেশ তার দিকে নজর দেবার চেষ্টা করতেই নন্দিতা সোজা ঢুকে গেল পেছনের ঘরটায়।

স্তূপাকার বই। অজস্র। বিচিত্র তাদের চেহারা, অদ্ভুত তাদের গন্ধ। কতদিনকার জীবন ওদের কে জানে। এরই মাঝে লুকিয়ে আছে মৃত্যুর পন্থা, নন্দিতার উদ্দেশ্য, ঔৎসুক্য।

বইগুলো সব ডাক্তারীর বই। মাতৃত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এখানে কোন ভেদ বিচার নেই। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় নেই, আছে শুধু বাস্তব। নিরস কৌতূহলের শেষ উত্তর।

নন্দিতা বেশ সমস্যায় পড়েছে। বইগুলো দেখা ওর অত্যন্ত দরকার, অথচ এমনি বিপদ, লজ্জা, সঙ্কোচ ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়ায় অথচ সাহসে কুলোয় না, পাশের র‍্যাকে আপনিই হাত পড়ে। হয়ত সংস্কৃত ব্যাকরণ। নাড়াচাড়া করে আবার নিজের জায়গায় রেখে দেয়।

এমনি করে সময় কাটে। নিজের মনকে নন্দিতা বাঁধতে পারে না। হাত বাড়ায়, বিবেক পেছিয়ে যায়। বিবেক স্থির হয়, হাত ঠিক জায়গায় পড়ে না। সঙ্কোচ হাত সরিয়ে দেয়।

সময় বয়ে যায়, আর দেরি করলে চলে না। বইখানা চোখের সামনে পড়ে তুলে নিলেই হয়, কিন্তু···

নন্দিতা চেয়ে দেখলে সমরেশ কি একটা লিখছে আর আগন্তুক একটা বই মনোযোগ সহকারে দেখছে।

নন্দিতা বইখানা তুলে নিল। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, কপালে

বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। ভয়ে। ভয় মানুষকে জন্তুতে পরিবর্তিত করে।

বইখানা হাত থেকে পড়ে যেত আর একটু হলে।

বইখানা ডাঃ দাশের "জননী ও জন্ম"

বইখানা তাড়াতাড়ি নন্দিতা ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললে। ছোট ছেলেরা মার সামনে যেমন করে ভাতের থালা থেকে ভাত তুলে নেয় ঘুঁড়ি জুড়বার জন্যে।

মার খাবার ভয় আছে, আর আছে ধরা পড়বার লজ্জা।

নন্দিতা চেয়ে দেখলে ওরা দুজনেই ব্যস্ত, ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্য করেনি। যাক্, বাঁচা গেল।

নন্দিতার গলা থেকে একমনের ওজন যেন কে সরিয়ে ফেল্লে। ত্রস্ত-পদে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নন্দিতা বলে গেল—

"একটা বই নিলাম, Text নয়, কাল ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা বেশ, দেবেন এখন।"

নন্দিতা ততক্ষণে মোড়ের ওপারে।

নন্দিতা ত্রস্তপদে হোষ্টেলে ফিরছে। একরকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই। পথে দেখা হল অণিমার সঙ্গে।

হাতে বয়ের থলেটার দিকে চেয়ে অণিমা বল্লে "কি বই নন্দিতাদি?"

অণিমা সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী, পড়ে আর্টস্; তাই রক্ষে।

নন্দিতা দাঁড়াল না, যেতে যেতে বল্লে "এমনি, কিছু নয়!"

অণিমা অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে। মনে মনে হেসে, মুখে বল্লে "বেচারী!"

কথাটার সুর নন্দিতার কানে গেল; গায়ের রক্ত যেন হিমশীতল। সহানুভূতি নয়, যেন বরফের ছুরি।

আরও জোরে ছুটে চল্লো নন্দিতা।

পথরোধ করল শ্যামলিমা। থামিয়ে বল্লে—

"তোমার শরীর কেমন নন্দিতা? সামনেই পরীক্ষা, তৈরী হচ্ছ ত?"

নন্দিতা ভাবলে কোন "পরীক্ষা"।

তবে কি···? সেও ত পরীক্ষা।

জড়িত কণ্ঠে বল্লে—"হ্যাঁ!"

আবার ছুটে চলা। এক পলকের বেশী ও কোথায়ও থামবে না। প্রশ্নের যেন জোয়ার বইছে।

ওর শরীর খারাপ হয়েছে, আর পাঁচজনের যেন তাতে অহেতুক আনন্দ।

একে একে আরও অনেকে প্রশ্ন করলে, সেই একই প্রশ্ন, শরীর কেমন? যত্ন নাও! শুকিয়ে যাচ্ছ! পরীক্ষা কবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি,—

নন্দিতা সত্যই উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। যে সব কথা শুনলে ও হাসত, সে সব কথায় আজকাল ওর কান্না পায়। যে সব কথা শুনে মনে হত সত্যি কথা, আজকাল সে সব কথা মনে হয় অলীক, অবান্তর, বিকার!

জীবনের প্রতি ওর যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহজ, সুন্দর, আজকাল তা বক্র।

জীবনের সহজ গতি যৌবনের আবর্তে এসে জটিল হয়ে উঠল।

নন্দিতা নিয়তির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দেখল' সামনেই পতন। নীচে গভীর গহ্বর, সেখানে শুধু অন্ধকার!

পরদিন ভোর বেলায় বাসন্তীর ঘুম ভাঙ্‌ল একটা ঝাঁঝাল গন্ধে। ঘুম জড়ান দৃষ্টিতে সে আবছায়া দেখতে পেল নন্দিতা ষ্টোভ জ্বেলে গভীর মনোযোগ সহকারে কি একটা জিনিষ রাঁধছে। তার দৃষ্টিতে একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা। বাসন্তীর বিছানা থেকে ওর শিলোটি (Silhouette) দেখা যায়। বাইরে তখন তিমির অন্ধকার। ষ্টোভের নিলাভ আলোতে ও যেন বিশ্রী, কদাকার। কালচে নীল আলোতে যেন সয়তান দেবতাকে খুন করতে উদ্যত; তেমনি ভীষণ, তেমনি নিষ্ঠুর।

বাসন্তী চমকে উঠল'। তন্দ্রা গেল ছুটে। নিজের চোখকেই ও বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ দুটি ভাল করে রগড়ে নিলে। সেই একই দৃশ্য; আরও নিষ্ঠুর, আরও কদাকার।

নন্দিতা ষ্টোভের দিকে ঝুঁকে পড়েছে; কপালে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম; চুল গুলো উস্কোখুস্কো।

বাসন্তী কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পেল নন্দিতার গভীর কাল রেখার মাঝখানে কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠল বাসন্তী।

সুন্দরী নন্দিতার এ কি উগ্রমূর্ত্তি!

সন্তর্পণে ডাকল "নন্দিতা!"

নন্দিতা শুনতে পেল না। ও আপন মনে রেঁধেই চলেছে। আবার ডাকল "নন্দিতা।"

নন্দিতা চমকে উঠল।

হত্যাকারীর হাত পেছন থেকে যেন কেউ ধরে ফেলেছে। পাষাণের মতন নন্দিতা বসে রইল। পাশ ফিরে চাইবার ক্ষমতাও যেন ওর নেই। ঠাণ্ডা বাতাস এসে যেন ওকে জমিয়ে দিয়েছে। ও আর মানুষ নয়, সাদা পাথরে খোদাই করা নারীর কঙ্কাল মূর্ত্তি।

বাসন্তী এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নন্দিতা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? অজ্ঞাত ভয় ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিছানা ছেড়ে খুব সন্তর্পণে বাসন্তী নন্দিতার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। নন্দিতা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

বাসন্তী জিজ্ঞেস করলে "নন্দিতা কি করছিস?"

নন্দিতা চামচটা নাড়তে নাড়তে বল্লে "একটা ওষুধ তৈরী করছি।" —ভাবটা এমন, যেন কিছুই নয়।

ওষুধ? বাসন্তী জিজ্ঞেস করলে "ওষুধ কি হবে?"

নন্দিতা তেমনি সহজ ভাবেই উত্তর দিলে "বিশেষ কিছু নয়, শরীরটা একটু খারাপ তাই!"

"এ সব ছাই পাঁশ খেয়ে কি লাভ হবে, ডাক্তার বাবুকে বলে একটা ওষুধ নিলেইত পারিস!"

"দরকার নেই, এতেই হবে!'

—"প্রেমাঙ্কুর ত' এবার ডাক্তার হবে, ওর কাছ থেকেই না হয় ওষুধ চেয়ে নে!"

নন্দিতা আবার চমকে উঠল। বাসন্তী কি তবে ব্যাপারটা জানে নাকি? বল্লে, "প্রেমাঙ্কুর—না, না, তার কোন দরকার নেই!"

দুজনেই নীরব। নন্দিতা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে ও এখন কথা বলতে চায় না, কারো উপস্থিতি পর্য্যন্ত ওর অসহ্য। বাসন্তী টুথপেষ্ট আর ব্রাসটা নিয়ে নেবে গেল। নন্দিতা যেন কেমন হয়ে গেছে এক দিন। ওর চাল চলনে, আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় না আছে কোন ছিরি, না

আছে কোন ছাঁদ। পড়ায় ওর মন নেই, চেহারা দিন দিন হয়ে যাচ্ছে যেন কঙ্কাল। সব সময় কি ভাবে, কি করে, যেন যন্ত্র চালিত পুতুল।

·· বাসন্তী চলে গেল।

নন্দিতা প্যানটা নাবালো। ওষুধটা তখনও টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। গরম ভাপ বেরুচ্ছে, বিচ্ছিরি একটা গন্ধ।

নন্দিতা কি যেন ভাবল। হাত কাঁপছে, মুখ খানা সাদা, ঘামছে। দৃষ্টিশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে, ফ্যাকাশে।

দ্বন্দ্ব। একদিকে জন্ম, অন্যদিকে মৃত্যু। একদিকে মাতৃত্ব, অন্যদিকে সমাজ। একদিকে অনাগত শিশুর কলহাসি। অন্যদিকে কলঙ্ক। উপলক্ষ্য সৃষ্টি।

নন্দিতা ভাবছে।

সময় ছুটে চলেছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত।

ঘড়িটা বিকট চীৎকার করে ছুটে চলেছে। বাইরে অন্ধকার তখন জমাট বাঁধা। নন্দিতার দৃষ্টিতে পৃথিবী শুধু কাল পাথর। আলো নেই, বাতাস নেই, প্রাণ নেই, আছে শুধু অন্ধকার—শুধু অন্ধকার।

আর দেরি করলে চলে না। ওষুধটা নন্দিতা গেলাসে ঢেলে নিল। হাতে তুলে নিল। ঠোঁটের কাছে তুলে নিল। হাতটা ওর আপনিই আবার নেমে এল।

শিশু যেন অনুনয় করলে।

কিন্তু না, নন্দিতা আজ কিছু মানবে না। জোর করে নন্দিতা ওষুধটা খেয়ে ফেল্লে। এক চুমুকে সব শেষ।

হাত থেকে গেলাসটা পড়ে ভেঙে গেল।

দূর দিগন্তে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হোল।

ঝন্। ঝন্। ঝন্।...

পৃথিবী যেন চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত লোক একসঙ্গে চীৎকার করে নন্দিতাকে বল্লে—

হত্যা! খুন!...

নন্দিতার জ্ঞানহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। ডান হাতটা ছিটকে পড়ল কাঁচের টুকরোগুলোর ওপর। একটা কাঁচের টুকারাতে হাতটা কেটে গেল। দুফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

পরাজিত মাতৃত্ব অশ্রু বিসর্জন করছে।
সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে একটি কথাকে কেন্দ্র করে।
খুন।
নন্দিতা আজ নন্দিতা নয়—হত্যাকারী।
কার প্ররোচনায় ?···
কলঙ্কের ভয়ে ?”···
না সমাজের অত্যাচারে ?

এমনি করে দিনের পর দিন সভ্যতার বুকে হত্যার লীলাখেলা চলেছে। মানুষ এমনি করে সৃষ্টির গলা টিপে মারছে। প্রত্যহ, নিত্য নৈমিত্তিক।

কিন্তু তবু সমাজ সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দর্পের সুরে সে প্রতি মুহূর্তে চীৎকার করে বলে—“আমি সমাজ।” কি দরকার এরকম সমাজের ? যে সমাজ মানুষের চিরনতুন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে, যে সমাজ সৃষ্টির গলা চেপে ধরে, কি দরকার এমন সমাজের ?

সভ্যতা ?

কিসের সভ্যতা ? এর চেয়ে সেই আদিম অসভ্যতা ছিল ঢের ভাল। মানুষের চরিত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলত না, মানুষ তখন ছিল মানুষ, কলের পুতুল নয়।

বেলা চারটার সময় নন্দিতা গেল প্যানটা ফেরৎ দিতে। রান্নার পাট চুকে গেছে। মেয়েদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। কেউ নেই।

নন্দিতা গেল আন্নাদির ঘরে। আন্নাকালি মেয়েদের রান্নাঘরের পরিচালিকা। বয়স ত্রিশের ওপর। দোহারার চেহারা, ঘন শ্যামবর্ণ। শিক্ষার দৌড় নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত। চেহার মধ্যে সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই, অসভ্যতার প্রতিমূর্ত্তি। বড় গোল গোল চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা, সব-সময় উদ্দেশ্য ভেদ করে ছুটে যায় চুলচেরা বিচার করতে। চাউনি নিষ্ঠুর, কদর্য্য, কুৎসিত !···

কালো মোটা চেহারা, কিন্তু পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদ।
কথা নয়, চীৎকার। হাসি নয়, অট্টহাস্য।
সব জড়িয়ে একটা কুৎসিত ব্যাপার।

আন্নাকালির মা ছিল এই চাকরিতে। সে আজ প্রায় যোল বছরের কথা। ও যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, হঠাৎ একদিন চলে গেল। মা বল্লে মেয়ের বিয়ে, সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে কন্যাদায়ের দোহাই দিয়ে চাঁদা পর্য্যন্ত তুললে। বছর খানেক পরে মেয়ে ফিরে এল, সিঁথিতে সিঁদূর, কোলে ছেলে। কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে, কেউ করলে না। যারা করলে তারা সন্দিগ্ধ মনে আন্নাকালির দিকে চাইল, মনে মনে ভাবল' কোনটা কিসের জন্যে ? সিঁদূরের জন্যে ছেলে, না ছেলের জন্যে সিঁদূর !

দশবছর বয়সে ছেলে মারা গেল। আন্নাকালি কিছুদিন চুপচাপ রইল, তারপর সব ভুলে গেল। ইতিমধ্যে মেয়েদের কলেজ বিভাগ খুললো, বড় মেয়েরা ভর্ত্তি হল। তাদের দেখাদেখি আন্নাকালি স্নো চিনলো, পাউডার চিনলো, সেণ্ট চিনলো।

স্নো পাউডার সেণ্টের প্রাচুর্য্যে আন্নাকালির কালি মুছে গেল, হ'ল আন্নাদি !

তারপর আরও ক'বছর কেটে গেছে।

সিঁদূর আর ছেলের কথা সবাই ভুলে গেছে।

নন্দিতা আন্নাকালির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল—"আন্নাদি !"

আন্নাকালি ভেতর থেকেই জবাব দিল—

"দাঁড়াও নন্দিতা, আসছি।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। পান খেয়ে দাঁতে কালো কালো দাগ পড়ে গেছে, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান ; পাতাকাটা, তেল গড়িয়ে পড়ছে। লালপেড়ে শাড়ী, কস্তাপাড় ; পায়ে সাদা জুতো। বুকে গোঁজা সস্তা সেণ্ট্ মাখান রুমাল। গায়ে যমুনা সাবানের গন্ধ।

নন্দিতা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছে, নিজেকে আন্নাদির শ্যেন দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ওর ভয় করে। আন্নাকালির দৃষ্টি তীব্র, বক্র। সোজা জিনিস দেখতে পায় না, বাকী সব ওর নজরে সহজেই ধরা পড়ে। অনেকটা ট্যারা দৃষ্টির মতন, সোজা দেখে না, আড়চোখে চায়। সব চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার ওর কুটিল হাসি। কথায় যা বলে শেষ করা যায় না ওর হাসিতে প্রকাশ পায় তার চেয়ে অনেক বেশী।

নন্দিতা ইতস্ততঃ করে বললে—

"এই নিন্ প্যান্টা।"

বলেই নন্দিতা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। আন্নাকালির মহৎ দোষ হ'ল অযথা জেরা করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। ওর বিশিষ্ট হাসিতে মুখখানা ত্যাবড়া করে বল্লে—

"কোন কাজে লাগল ?"

সেই মুখ বেঁকান হাসি ; অর্থপূর্ণ।

—"কি জানি !"

নির্লজ্জের মতন আন্নাকালি বললে—

—"চেহারা দেখছি দিনদিন খারাপ হচ্ছে, আপনার ডাক্তার বন্ধুকেই সব কথা বলে না হয় একটা ব্যবস্থা করুন !"

নন্দিতা ধরা পড়ে গেছে। পালাবার পথ নেই। লুকোবার উপায় নেই। বল্লে—"প্রেমাঙ্কুর ?—না, না, তা হয় না।"

মুখখানা ওর ফ্যাকাসে, যেন সাদা কাগজের তৈরী। দৃষ্টিতে অসহায়তা ; আন্নাকালির চেহারায় জয়ের সগর্ব দীপ্তি ; ভাবটা, আমায় ফাঁকি দিতে পারবে এমন লোক আজ পর্য্যন্ত জন্মায়নি। —"তাহলে কোন ভাল ডাক্তার দেখাও।"

একটু থেমে চারদিক ভাল করে দেখে গলা খাটো করে নন্দিতার দিকে বেঁকে বল্লে—"সন্ধানে আমার ভাল ডাক্তার আছে, যে কোন রকমের অসুখ তারা ভাল করে দেয় !"

নন্দিতা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। পারলে চীৎকার করে বলত' 'ধরণী দ্বিধা হও। অন্য সময়ে সে আন্নাকালির সঙ্গে কথা বলত না ; এ রকম মেয়েদের ও ঘৃণা করে। আন্নাকালি অনেক চেষ্টা করেও সাহস পায়নি নন্দিতার কাছে ঘেঁষতে। আর আজ ?

ভয় মানুষকে ভীতু করে না, করে জানোয়ার।

আজ ও যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়া লতা ; আন্নাকালি ওর শেষ আশ্রয়। নন্দিতা ভাবলে ছুটে পালাই, কিন্তু··· ।

কলঙ্ক ! সমাজ ! বিশ্ববিদ্যালয় !···

আজ আন্নাকালিই ওর সহায়, সম্বল। জড়িতকণ্ঠে বল্লে—

"যে কোন রকমের অসুখ ?···"

থেমে চারিদিক চেয়ে পায়ের নখ দিয়ে সিমেণ্টের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে বল্লে—"মানে···"

আর বলতে পারলে না। জীব ওর আড়ষ্ট, কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে। আন্নাকালি অবুঝ নয়। সেই অশ্লীল হাসি হেসে বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বল্লে—

"বুঝেছি আর বলতে হবে না! এই গত বছর B. A ক্লাসের একটি মেয়েকে বাঁচিয়ে দিলে, কাক পক্ষীও জানতে পারলে না। সত্যি কথা, নন্দিতাও শোনেনি। নন্দিতা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। একটু আশার আলো যেন একবার উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু শুধু কি তাই? ওর মতন আর একজনও তাহলে

মানুষের মন কি নীচ। শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, এসব একটা মুখোস মাত্র। নীচু স্তরের মনটিকে চাপা দিয়ে রাখে। বিপদের ঝড় উঠলে, মুখোস যায় সরে, বের হয়ে পড়ে কুৎসিত, অশিক্ষিত, স্বার্থপর চেহারা। নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে—

"তবে কি,..." কথাটা শেষ করতে পারলে না, ক্ষণিকের ঝড় সরে গেল, শিক্ষার আবরণ আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল; কথাটা ঘুরিয়ে বল্লে—"কি অসুখ করেছিল তাঁর?"

আন্নাকালি হেসে জবাব দিল—

"মানে, একটু বিপদে পড়েছিল আর কি!"

কথায় যেটা প্রকাশ করল না, সেটা করল হাসিতে আর কুটিল দৃষ্টিতে, অসভ্যের মতন অঙ্গভঙ্গীতে।

নন্দিতা বুঝল, বল্লে—

"ও আচ্ছা, আচ্ছা..."

আর দাঁড়ান যায় না। অস্পষ্ট কথাবার্ত্তায় ব্যাপারটা আরও সহজ অথচ কুৎসিত হয়ে পড়েছে। ছবিতে নগ্নমূর্তি শিল্প, কিন্তু বাস্তবে তা অসভ্যতা। নন্দিতা ফিরবার পথে পা বাড়াল, অনিচ্ছাকৃত। আসল ঠিকানাটাই এখনও নেওয়া হয়নি।

আন্নাকালিই সমস্যার সমাধানে করে দিলে।

বল্লে "আমি তাহলে খবর দেব।"

নন্দিতা স্পষ্ট বলতে পারলে না 'আচ্ছা'। যেতে যেতে গভীর নিশ্বাসের আচরণে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

অস্পষ্ট বল্লে "আচ্ছা।"

আন্নাকালি বিজয়ের গর্বে হেসে উঠল।

অসভ্য, অশ্লীল।

প্রেমাঙ্কুর আবার সেই পুরণো মানুষ।

নন্দিতাকে সে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মন থেকে। ওর জীবনে নন্দিতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নন্দিতার যেটুকু আছে সেটা আবছায়া, বহুদিন আগে দেখা সুখ-স্বপ্নের মতন। দরকার নেই, না থাকলেও চলত; আছে, ভাবতে ভাল লাগে। পুরুষের আদিম কামনা, তার চিরাচরিত প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করায় নারীর যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন মাত্র।

গতানুগতিক পুরুষ; কবিতা লেখে, বড় বড় কথা নিয়ে খেলা করে, দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় তোলে সময় অসময়ে, কিন্তু সবই অলীক, অবাস্তব। প্রকৃতি যেমন নিজের রূপসজ্জা করে একটির পর একটি ঋতুর বসন পরে, পুরুষরাও তেমনি যৌবনের তৃপ্তি সাধন করে এই সব জিনিষে। আত্মতৃপ্তির জন্যে নয়, নৈতিক উন্নতির জন্যে নয়। নিজেকে নারীর চোখে সুন্দর করবার জন্যে, বড় করবার জন্যে, কমনীয় করবার জন্যে। নারীর মনে কামনার উদ্রেকের জন্যে। তাকে জয় করবার জন্যে।

সবার শেষে আছে নারী; ইপ্সা; প্রবৃত্তি।

নন্দিতা আর কাম্য নয়, ওর চোখে অসামান্য কিছু নয়, সামান্য নারী। রক্তমাংসে গড়া; সংসারের একটা জীব।

সামনে পরীক্ষা, প্রেমাঙ্কুর উদাসীন। নন্দিতার কাছে যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিল ভুলে গেছে। খেয়ালের বশে মানুষ যেমন কবিতা লিখে, পরে তার মানে ভুলে যায়। সব সময় নন্দিতাকে এড়িয়ে চলে। দেখা হলে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে "কেমন আছ?"

নন্দিতা উদাস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। নিজেকে হারিয়ে ফেলে প্রেমাঙ্কুরের মধ্যে; মনে হয় যুগ যুগ ধরে এমনি দাঁড়িয়ে থাকলেও ওর শেষ হবে না। প্রেমাঙ্কুর আর সহপাঠী ছাত্র নয়, পুরুষ নয়, ওর নিজস্ব কিছু। এমন একটা কিছু যা পথে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না, কবিতার ছন্দে পাওয়া যায় না, সাহিত্যের বিলাসে পাওয়া যায় না। এসবের বহু উর্দ্ধে, অন্য রাজ্যের মানুষ। সেখানে দ্বেষ হিংসা আত্মীয় পরিজন কিছু নেই; আছে শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন

যোগাযোগ, যে পাওয়া জীবনের চরম পাওয়া সেই পাওয়া। সৃষ্টির আনন্দে পাওয়া।

ওরই সৃষ্টিধারায় স্নাত হয়ে নন্দিতার মাতৃত্ব নয়ন উন্মিলীত করেছে! ওই ওর সন্তানের পিতা···

ওর মাতৃত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে ওরই পিতৃত্ব!

প্রেমাঙ্কুর যতদূরে সরে যেতে চায়, নন্দিতা তত ওকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

নারী পুরুষ আর সৃষ্টি নিয়ে পৃথিবী। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির আলোতে নারী আর পুরুষকে বিশ্লেষণ করে দেখলে এইখানেই তাদের প্রভেদ।

এই ভাঙা গড়া নিয়ে পৃথিবী, জীবন, জীবনের গতি। দিনের উজ্জ্বল আলোতে, প্রকাশ্য দিবালোকে, জনতার মধ্যে প্রেমাঙ্কুর নন্দিতাকে দেখে। অন্ধকারে ভয় পায়।

দেখা হলে কথা বলতে ভয় পায়। মনে তার পাপ। নিজে সে অপরাধী। বাস্তবের আলোকে সে জীবনকে দেখতে শিখেছে। নন্দিতাকে ভয় পায়, পাছে নন্দিতা তাকে জড়িয়ে ধরে, পাছে নন্দিতা ওকে আশ্রয় করে। এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে করবার মতন ক্ষমতা তার নেই, নেই সাহস; নেই শক্তি। সে চিরাচরিত পুরুষের মতন কাপুরুষ; দুর্বল।

সভয়ে জিজ্ঞেস করে "কেমন আছ নন্দিতা!"

উত্তরের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। মুহূর্তগুলো মনে হয় শতাব্দী; দম্ বন্ধ হয়ে আসে, পৃথিবী ঘুরতে থাকে; চোখের সামনে জমাট কালো অন্ধকার।

নন্দিতা হাসে। অসহায় পুরুষ তার সামনে নিজেকে মেলে ধরেছে। পুরুষের এ রূপ সে চেনে। প্রেমাঙ্কুর বড় দুর্বল, বড় অসহায়; কিন্তু তবু সে তাকে ভালবাসে। যে আসছে সে ওরই সন্তান। ওর মাতৃত্বকে প্রকাশিত করেছে প্রেমাঙ্কুর। নন্দিতার জীবনের প্রতি মুহূর্তে যে নারীত্ব ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, ফুটে উঠেছে, সেই নারীত্বকে রূপ দিয়েছে এই যুবক, এই মানুষ, এই পুরুষ।

ম্লান হেসে বলে "ভাল!"

দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে; প্রেমাঙ্কুরকে বলে; ওকে জানিয়ে দেয়।

ওকে নিয়ে আবার চলে যায় জনতার বাইরে, সভ্যতার নাগালের বাইরে, পৃথিবীর জটিল গতিপথের শেষে, সরল প্রকৃতির বুকে। দুজনে হাত ধরে নিশ্চল পাষাণের মতন দাঁড়িয়ে, নয়নে নয়ন রেখে অনাগত শিশুকে কল্পনা দৃষ্টিতে কোলে করে বলে—"স্বাগতম!"

কিন্তু পারে না। ভয় পায়। প্রেমাঙ্কুর যদি কিছু মনে করে, যদি ও রাগ করে, যদি ও আরও দূরে সরে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে "প্রেমাঙ্কুর আজকাল তুমি যেন আর সে প্রেমাঙ্কুর নেই, অন্য মানুষ!"

প্রেমাঙ্কুর গম্ভীর হয়ে বলে—

"সামনে পরীক্ষা!"

নন্দিতা সরল হয়ে ওঠে, ছেলেমানুষের মতন হেসে বলে "তাই নাকি! এত পড়ায় মন কবে থেকে হল?"

প্রেমাঙ্কুর উত্তর দেয় না। এদিক ওদিক চেয়ে পালাবার পথ খোঁজে। হঠাৎ বলে "চলি, কাজ আছে!"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলতে আরম্ভ করে। জনতার মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওর চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে নন্দিতা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে। উদাস দৃষ্টি, অর্থহীন, ভাসা ভাসা।

যতক্ষণ প্রেমাঙ্কুর সামনে থাকে নন্দিতা সব ভুলে যায়। সমাজ, কলঙ্ক সব। কল্পনার লীলা খেলা চলতে থাকে। ছোট্ট সংসার, স্বামী, স্ত্রী, ফুটফুটে একটি ছেলে, পরিপূর্ণ শান্তি; প্রেম; ভালবাসা; মান, অভিমান, সুখ, দুঃখ।

ক্ষণিকের বিলাস। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ওর নিজের চাপা দীর্ঘনিশ্বাসে। ধীরে ধীরে নেমে আসে পৃথিবী, তার সমাজ নিয়ে, পুরুষ নিয়ে, কলঙ্ক, অপবাদ ঘৃণার বোঝা নিয়ে, সংগ্রাম নিয়ে।

জীবন তার জঞ্জাল নিয়ে।

নন্দিতা ফেরার পথে পা বাড়ায়।

অন্ততঃ পনের দিনের মধ্যে দুজনেই নিশ্চিন্ত। প্রেমাঙ্কুরকে দাঁড়াতে হবে না বাস্তবের সামনে, সভয়ে সসঙ্কোচে; আর নন্দিতাকে করতে হবে না ভাল থাকার অভিনয়!

নন্দিতা কয়েকটা ঠিকানা সংগ্রহ করে পা বাড়াল কলকাতার পথে।

ব্যাঙ্কে আছে মাত্র বারশ টাকা।

জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে মাত্র বারশ টাকা!

যাবার আগে বলে গেল বাসন্তীকে; কলেজ থেকে নিয়ে গেল ছুটি অসুস্থতার অজুহাতে।

ভোরের ট্রেনে নন্দিতা এসেছে, কাজেই নিশ্চুপে কার্য্য সমাধা হয়েছে। কারও কাছে জবাবদিহী করতে হয়নি, হাজারটা প্রশ্নকে সত্য মিথ্যার আবরণে ঢাকতে হয়নি। জেরা করাকে নন্দিতা ঘৃণা করে। ব্যাগটি তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাসন্তীকে কোন কথা বলেনি। বলবার মতন মনের অবস্থা ছিল না।

রাত্রির অন্ধকারে গাড়ীতে উঠতে উঠতে বলেছিল—

"বাসন্তী, জানিনা, হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা।"

বাসন্তী বড্ড ছেলেমানুষ, নন্দিতাকে ভয়ানক ভালবাসে, তাই নিজেকে সামলাতে পারেনি, কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিল—

"ছিঃ নন্দিতা, বিপদ কি মানুষের হয় না। অসুখ সারলেই ফিরে আসিস্!"

নন্দিতা কাঁদবে না। হাসতে হাসতে বল্লে—

"সেই আশীর্ব্বাদই কর ভাই।"

গাড়ি ছেড়ে দিল। বাসন্তী চীৎকার করে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মতন। নন্দিতা নীরব। কান্নার গতি আটকালো সংগ্রামের দোহাই দিয়ে। মনকে প্রবোধ দিয়ে মনে মনে বল্লে—

"সবে ত' আরম্ভ, এমনি কত আপন লোককে বিদায় দিতে হবে। কাউকে দেখে, কাউকে না দেখে।"

গাড়ীর গতির আবর্তে বাসন্তী চাপা পড়ে গেল, সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় টাউনটি।

দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার যাত্রা হল সুরু!

কলকাতা পৌঁছাল ভোরবেলায়।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ইন্ করেছে, নন্দিতা জানলা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের দিকে।

আজ প্রথম তার মনে হল বাবাকে সে চিরতরে হারিয়েছে। তার

মনে পড়ে গেল ফেলে আসা জীবনের ছোটবড় নানান ঘটনা। সে যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে কিম্বা পূজোর সময় আগে আগে ফিরত, এই ট্রেনেই ফিরত; আর তার বাবা সেই কোন ভোরবেলা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন মেয়ের প্রতীক্ষায়। তাঁর ভয় পাছে কলকাতা সহরে মেয়ে তাঁর হারিয়ে যায়। অথচ সে যে প্রায় পাঁচশ মাইল একা আসছে তাতে কিছু হয় না! কলকাতা সহরকে কেন যে লোকে এত ভয় পায়! বাবার ব্যাপার দেখত আর নন্দিতা ছেলেমানুষের মতন হাসত, বলত—

"আচ্ছা বাবা, তুমিত বেশ লোক, এই এতদূর একলা এলাম, আর এই সামান্য পথটুকু একলা যেতে পারতাম না?"

বাবাও ছেলেমানুষের মতন হাসতেন, বোঝাতে বোঝাতে বলতেন— "তুই বুঝিস্ না রে, কলকাতা সহর বড় পাজি জায়গা,—একলা হারিয়ে যেতে এরকম প্রশস্ত জায়গা আর দুনিয়ায় দুটো নেই। নে, নে, পাগলী চল, চল, তাড়াতাড়ি চল, আমার আবার একরাজ্যের কাজ পড়ে আছে।"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট উল্টে নন্দিতা সুটকেসের ওপর বসে পড়ে, বলে—"না আসলেই পারতে, আমার সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলতেও তোমার ইচ্ছে করে না, সামনে পূজোর ছুটিতে আমি আর আসব না!"

বৃদ্ধ গলে যান, কি করে যে বোঝাবেন তা নয়—কাজের দোহাই দেওয়া আজকাল স্বভাবে দাঁড়িয়েছে; মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন "মা, রাগ করলি ত'......" তারপর থেমে আবার বলেন, "তুই দেখেনিস্, যে কয়দিন তুই থাকবি আমি এক মিনিটও কাজ করব না, তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

স্ত্রীকে হারাবার পর থেকে বৃদ্ধের এই দুটিই একমাত্র অবলম্বন। নন্দিতা আর কাজ।

যতক্ষণ নন্দিতা কাছে থাকে ততক্ষণ সেই সব, কারণ নন্দিতা শুধু মেয়ে নয়, স্ত্রীর স্মৃতি-চিহ্ন।

নন্দিতার বার বার মনে পড়ছিল বাবার কথা!

লোকে লোকারণ্য হাওড়া ষ্টেসন্; আজ কিছু বেশী ভীড়, অথচ নন্দিতার মন কাঁদছিল সেই একটি লোকের জন্যে যে আজ নেই।

সেই একটি লোকের অভাবে নন্দিতার মনে হল, প্ল্যাটফর্ম যেন খালি। ট্রেন তেমনি এসে থামল। কুলিরা তেমনি চেঁচামেচি করছে, চেকাররা পয়সা রোজগারের তালে তেমনি ওৎপেতে ঘোরাঘুরি করছে, তেমনি কোলাহল, গোলমাল হুড়োহুড়ি……

অভাব খালি একটি লোকের; তাঁর ব্যগ্র দৃষ্টি; নন্দিতাকে দেখা মাত্র—স্মিতহাস্যে সরলভাবে চেঁচিয়ে ওঠা—"মা, এলি—আমি এইখানে!"

আনন্দের আতিশয্যে ট্রেনের সঙ্গে ছুটে চলা, কুলি মজুরদের সঙ্গে, চেকারদের সঙ্গে ধাক্কা দেওয়া—হাসিমুখে ক্ষমা চাওয়া!

নন্দিতার আজ প্রথম মনে হল, এতবড় পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ একা! হারিয়ে যেতে পারে, ভাববার কেউ নেই। মরে যেতে পারে, দুঃখ করবার কেউ নেই……। পৃথিবীর গতি এখানে উন্মত্ত। সময় এখানে ছুটে চলে পলকে পলকে। তার সঙ্গে সমতালে ছুটে চলেছে মানুষ, যেন বিদ্যুতের পুতুল; টাকার পেছনে পেছনে।

শুধু কাজ; কোলাহল;
কর্ম কোলাহল মুখরিত পৃথিবী।
নন্দিতা এদের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললে।

তবু ভাল। সামান্য কয়েকজোড়া চোখ উনিভারসিটি টাউনে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল; পৃথিবীর সীমার বাইরে ছোট্ট জায়গা, সামান্য দুর্ঘটনাও যেন প্রকাণ্ড একসিডেণ্ট।

এখানে হাজার হাজার জোড়া চোখ, সবাই নিজেকে সামলে রাখছে; নিজের পথ দেখছে, অন্যকে লক্ষ্য করবার সময় নেই। একবার দৃষ্টি ফেরালে নিজেই হয়ত গুঁড়ো হয়ে যাবে।

নন্দিতা নিশ্চিন্ত হল; শরীর খারাপ আর খেতে না পারার জন্যে কারো কাছে জবাবদিহী করতে হবে না।

থাকবার জন্যে হোটেল বেছে নিল 'হলিউড'।

বিকেল বেলা গা ধুয়ে নন্দিতা বের হল; ট্রামে উঠে চলে গেল শ্যামবাজারের দিকে।

ছোট্ট গলির মুখে পুরণো একটা বাড়ী, বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলছে।

ডাঃ ব্রজেন বোস। আরও অনেক কিছু লেখা ছিল, কিন্তু সময়ের দোষে সব মুছে গেছে।

পৈতে হীন চেনা বামন।

উদ্ধারের প্রয়োজন হ'লে লোকে আপনিই চিনে নেয়।

নন্দিতা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল।

ইনি ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাশ করা ডাক্তার। আন্নাকালি যখন প্রথম বিবাহ উপলক্ষে উনিভারসিটি টাউন পরিত্যাগ করে তখন ইনিই ছিলেন তার সহযাত্রী। সেই সূত্রে যোগাযোগ।

ঘরখানা জীর্ণ দীর্ণ, অসম্ভব রকম ময়লা। সচরাচর যে ভদ্রলোক আসেনা তারই প্রমাণ। ভাঙা একখানা কেরোসিন কাঠের টেবিল, তার ওপরে ভাঙা একখানা মোটা কাঁচপাতা। কাঁচের তলায় দুবছরের একটা পুরণ কার্ড ক্যালেণ্ডার, দুএকখানা চিঠি, ছেঁড়া দুএকটা কি সব লেখা কাগজের টুকরো। টেবিলের ওপর একটা ব্লটিং পেপার, ময়লা। কালির দাগ আর ধূলোর সংমিশ্রণে সেটা লালচে হয়ে উঠেছে। একটা দোয়াত, কালকালি এককালে ছিল। ভাঙা দুটো কলম, কাল। একটাতে নিব নেই, অন্যটাতে আছে, ভাঙা। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার, সিনেমার কোন অভিনেত্রীর ছবি। একপাশে একটা পুরণো খবরের কাগজ টাঙান, তার ওপরে একটা কোট ঝুলছে।

সব মিলিয়ে ঘরখানা যেন ছাতাপড়া দাঁত বের করে হাসছে।

আন্নাকালি যে ইতিমধ্যেই সমস্ত খবর জানিয়ে দিয়েছে তার প্রমাণ দিলেন ডাঃ বোস নিজেই। গায়নোকলজির বইখানা সরিয়ে রেখে অসভ্যর মতন হেসে বল্লেন—

"আসুন, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি, ভেবেছিলাম সকালেই আসবেন।" নন্দিতার ইচ্ছে করছিল ছুটে পালায়। কলকাতার পোষাকী সভ্যতার তলায় যে এত কুৎসিত দেহ আছে, নন্দিতা জানত না।

নন্দিতা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত পালিয়ে যেত। ডাঃ বোস বল্লেন—

"দেরি করে লাভ নেই, আসুন পরীক্ষাটা সেরে নি।"

এরকম পেসেণ্ট ও পায়নি আজ পর্য্যন্ত ; এ যে কলেজের ছাত্রী ও নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না।

উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লে—

—"চলুন ঐ ঘরটায়, আপনি তৈরী হয়ে নিন, আমি আসছি!"

নন্দিতা মন্ত্রচালিতের মত ঢুকে গেল।

অন্ধকার ঘর। বিশ্রী একটা গন্ধ। ময়লা গদি পাতা একটা অপারেশান টেবিল। দুপাশের তাকে নানান রকম ওষুধ। একটা ছোট্ট আলমারিতে কয়েকটা সাজ-সরঞ্জাম। নন্দিতা টেবিলের পাশে চুপ করে দাঁড়াল।

ডাঃ বোস ঘরে ঢুকলেন ; হাতটা গুটোনো। অন্ধকারে চোখ দুটো জল্ জল্ করছে। নন্দিতাকে নিয়ে তারা যেন সার্কাসের খেলা খেলছে।

বিকট ভাবে হেসে বল্লেন—

ভয় করছে নাকি ? না, না, ভয় করবার কিছু নেই।

নন্দিতা নিরুত্তর।

ডাঃ বোস দরজা বন্ধ করে দিলেন।

জমাট অন্ধকার, আলোটা যেন জোনাকী পোকা।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ঘর থেকে বের হতে হতে বল্লে—

"একটু দেরি হয়ে গেছে, আরও আগে আসা উচিত ছিল। যাক, আজ রাত্রি আটটায় অপারেশন্, এখন যেতে পারেন।"

নন্দিতা চলে যাচ্ছিল, চমকে দাঁড়াল।

বিকট অট্টহাস্য, এক ঝলক মদের গন্ধ ছড়িয়ে বল্লে—

"আমার ফিটা ! কুড়ি টাকা !……ধন্যবাদ !……আসছেন ত ?"

নন্দিতা তখন বাইরে !

আবার সেই কলকাতা শহর। সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে জ্বল্ জ্বল করছে। ট্রাম ; বাস ; দোকান ; সিনেমা ; বায়স্কোপ ; পুরুষ ও নারী !

চেঁচামেচি, গোলমাল।

ব্যস্ততা ; হুড়োহুড়ি ; দৌড়োদৌড়ি।

জনতা।

প্রত্যেকটি জিনিষ সভ্যতার মাপকাঠিতে ওজন করে বসান। কোথাও কোন খুঁত নেই। ভুলচুক নেই।

নিখুঁত; পরিপাটি।

পরদিন সকালবেলা নন্দিতা আবার বের হল।

ডাঃ মিস সরমা গুপ্তা।

সকাল আটটা। প্রকাণ্ড ওয়েটিং-রুম। ঘরভর্তি পেসেণ্ট।

বালিকা; যুবতী; প্রৌঢ়া; বৃদ্ধা।

সকলেই প্রায় নিশ্চুপ; বোবা।

মাঝে মাঝে দু একজন ফিস্ ফিস্ করে দু একটা কথা বলছে, চাপা, দু'একটা প্রশ্ন; উত্তর; ছোট ছোট ইতিহাস। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করছে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা; কেউ উদগ্রীব হয়ে তা শুনছে।

নন্দিতা ঘরে ঢুকতেই সকলে চুপ করলে। অতজোড়া নারীচক্ষু ওর দিকে নিবদ্ধ। নন্দিতা অপ্রস্তুতে পড়ল। চোখের সামনে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কোণের একটা চেয়ারে নন্দিতা বসে পড়ল।

আবার মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি; আবার কথাবার্ত্তা।

বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়ে, রোগের আক্রমণে সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ।

ভেদাভেদ জ্ঞান যেন কারো নেই।

নানান রকমের ব্যাধি। কেউ শীর্ণ; রক্তহীনতা। কেউ অত্যধিক মোটা; চর্বিবৃদ্ধি। এক বন্ধ্যা নারীর পাশে বসে আছে সাতটি সন্তানের মা। দুজনেই চায় চিকিৎসা; একজনের আরম্ভ, অন্যের শেষ।

নন্দিতার মতন যুবতী আছে আরও দুজন। একজন বিষণ্ণ। অন্যটি আনন্দে আত্মহারা। তার চেহারা প্রদীপ্ত, মাতৃত্ব যেন ফুটে বের হচ্ছে। ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি।

হাত পা নেড়ে ব্যাখ্যা করছে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা। বোধ হয় প্রথম সন্তান।

নন্দিতা চুপচাপ কোণে বসে; যেন বায়স্কোপ দেখছে। এরা যেন পৃথিবীর লোক নয়, অন্য জগতের মানুষ।

ঘরটি ছিমছাম, পরিষ্কার। ঝক্ ঝক্ করছে।

শিশুর সরল হাসির মতন মনোরম।

একে একে পাশের ঘরে ডাক পড়ছে। সাময়িক বিরতি।

আবার মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি।

সব শেষে নন্দিতার পালা।

সুন্দর ছোট্ট consultation room। ঝক্‌ঝকে আসবাব-পত্তর। ডাঃ সরমা গুপ্তা প্রৌঢ়া; দোহারা আকৃতি; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; মুখে সরল হাসি।

"বস!"

ভাল করে নন্দিতার দিকে চেয়ে বল্লেন—

"পাঁচের কোটায় পা দিয়েছ মনে হচ্ছে! ভাবনার কিছু নেই, এই কি প্রথম?"

নন্দিতা আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল; উত্তর দিতে গিয়ে বল্লে—

"আমি অবিবাহিতা।"

চকিতের জন্যে গম্ভীর হয়ে ডাঃ গুপ্তা বল্লেন—

"বুঝেছি!"......বিয়ে কর......"

"অসম্ভব!" "তা হয় না ডাঃ গুপ্তা; অসম্ভব।" প্রেমাঙ্কুরকে বিয়ে করা!...নন্দিতার হাসি পেল।

"কেন?"

নন্দিতা কি বলবে ভেবে পেল না। জড়িত কণ্ঠে বল্লে—

"তিনি বিবাহিত!"

কার কথা ভাবছিল নন্দিতা? প্রেমাঙ্কুরের না অন্য কারো?...নিজের অজান্তে; অত্যন্ত সঙ্গোপনে অন্য কেউ কি বাসা বেঁধেছে ওর মনে?......

ডাঃ গুপ্তা কলমটা নাড়তে নাড়তে বল্লেন—

"সেটা একটা সমস্যা; কত বড় বোকামী করেছ বুঝতে পারছ!"

"কি কর?"

নন্দিতা সসঙ্কোচে উত্তর দিলে—

"প্রাইভেট নার্স!"

—"নাম?"

"কণিকা হালদার।"

"তোমার আর্থিক অবস্থা?"

“খুব ভাল না—আমি নিজের রোজগারে চলি।” নন্দিতা সসঙ্কোচে উত্তর দিলে।

নির্জন ঘরে ওরা দুজন। একজন সৃষ্টির নিমিত্ত, আর একজন সহায়।

ডাঃ গুপ্তা কি ভাবলেন,—বললেন—

“এখনও ত দেরি আছে, তুমি এক কাজ কর, আরও মাস চারেক পর এস, আমি তোমায় একটি প্রসূতি আশ্রমে পাঠিয়ে দেব। সেখানে বিনা খরচে সব হয়ে যাবে; তারপর তারা তোমার সন্তান সম্বন্ধে পরামর্শ দেবে। ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিতা নির্বাক। দৃষ্টি অর্থহীন।

এবার নন্দিতা উঠে চলে যেতে পারে; তবু সে গেল না বসে রইল; তার চোখের সামনে একটির পর একটি নানান দৃশ্য ঘুরে যেতে থাকে; জীবনের সুখ দুঃখ মেশান রঙিন দৃশ্য।

কবে প্রথমে সে বাদামী রঙের একটা শাড়ি পরে দশ বছরের বালিকা, প্রথম গিয়েছিল ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলের ছাত্রী হয়েঃ বাবা তার নিজে গিয়েছিলেন সঙ্গে, তখনও ছিল ছোট্ট এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে। কি কান্না ওর সেদিন রাত্রে, যেদিন বাবা ওকে রেখে ফিরে গেলেন কলকাতায়। ও কল্পনাও করতে পারেনি যে একা রাত্রে ওকে থাকতে হবে। মাতৃহীন শিশু, পিতাকে ছেড়ে থাকবার কথা ও ভাবতেই পারেনি।

কেনই বা পারবে, ওর প্রত্যেক মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওর বাবার যত্ন, আদর, ব্যস্ততা।

সেই বাবাকে ছেড়ে থাকা?……সেদিন দুজনে মিলে ওরা কত কান্নাই না কেঁদেছিল। বাবার অস্পষ্ট চাপা কান্না আজও ওর মনে আছে স্পষ্ট……

যেন আজকের, এই মুহূর্তের ঘটনা!

তারপর কতদিন চলে গেছে। কত বিচিত্র ভাবে।

আর আজ?

বাবাকে ছেড়ে একলা থাকার ভয়ে যে নন্দিতা কেঁদেছিল, কালের চক্রান্তে আজ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে?

এর পর?……

মিস্ গুপ্তা নন্দিতার চেহারায় দেখলেন ভয়ের বিভীষিকাময় রূপ। সে ভয় পেয়েছে। এত বড় পৃথিবীর মাঝখানে সে একলা। অর্থের একান্ত অভাব। সমাজের রক্ত চক্ষু। যে আসছে সে পরিচয়হীন; সর্বোপরি মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব।

মিস্ গুপ্তা বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, দুঃস্থদের পরিচর্য্যার জন্যে আছে নারীকল্যাণ সমিতি পথে ঘাটে। তাছাড়া, তিনি থেমে বল্লেন, "তোমার মত অবস্থায় অনেকেই পড়ে, তুমি একলা নয়! মোহে অন্ধ হলে সমাজের মায়া কাটাতে হয়। যা হয়ে গেছে তার ওপর নেই হাত, যে আসছে তাকে আসতে দাও। মাতৃত্বের গরিমায় তাকে গরিয়ান করে তোল!

মিস্ গুপ্তা সমাজের জীব; সমাজের বিধিনিষেধ তাঁকে মানতে হয়, কারণ তিনি সমাজের সেবাদাসী। কিন্তু তবু চীৎকার করে বলতে পারলেন না, তুমি দোষী, তুমি সমাজের জঞ্জাল, তুমি সভ্যতার শত্রু।

আজ সমাজের চেয়ে বড় একটা জিনিষ তাঁর মনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। আজ সর্বোপরি তিনি নারী। তিনি মাতৃমূর্তি। সন্তান তাঁর জীবনের প্রতি শিরায় শিরায়।......

নন্দিতা উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সন্তান আমি চাই না, মিথ্যে কথা বলেছি আমি, কণিকা নয় আমার নাম, নার্স আমি নই, অর্থের সংস্থান আমার নেই...আমি, আমি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী!

উত্তেজিত হয়ে বলে চলে সন্তান আমি চাই না, চাই না, চাই না!

মিস্ গুপ্তা ধীর শান্ত ভাবেই বসেছিলেন। নন্দিতার হাতখানা ছিল টেবিলের ওপর। হিম শীতল। সাদা ধবধবে।

মিস্ গুপ্তা হাতখানা ধরে বল্লেন, "আমার ক্ষমতার বাইরে অনাগত শিশুর পথরোধ করা। পুরুষের আইনকানুন আমাকে দেয়নি সেই অধিকার। তা অন্যায়, অপরাধ।" পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বল্লেন—"ও ঘরে আছে সপ্তম সন্তান সম্ভবা মাতা। সাহায্য চায়। স্বামী তার দরিদ্র, অন্নের নেই সংস্থান। কিন্তু তবু, পুরুষ সে কথা বোঝে না, নারীর কাছ থেকে সে তার দাবী পূর্ণমাত্রায় বুঝে নেয়!

নন্দিতা উঠে দাঁড়াল।

"কত দিতে হবে?"

হেসে মিস্ গুপ্তা বল্লেন "কিচ্ছু না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় নন্দিতার দৃষ্টি গেল দরজার পাশটিতে। "অনাথ বালক বালিকাদের সাহায্য করুন"—একটা তালা বন্ধ ছোট্ট বাক্স। নন্দিতা তাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এল পথে। কাকে সাহায্য করলে ও ?

প্রশস্ত রাজপথ······

সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঝলসে যাচ্ছে প্রখর তপন তাপে। পথে পথে থেমে গেছে লোক চলাচল! দোকানীরা ঝিমুচ্ছে ; গাছের তলায় বসেছে কুলীদের আড্ডা। রিক্সার মধ্যে চালক ঘুমে অচেতন। পৃথিবীর অবিরাম ছুটে চলায় ক্ষণিকের বিরতি।

নন্দিতা ছুটে চলে ; নিজেকে সামলে নিয়ে।

চোখের সামনে তার দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

রাস্তার মোড়ে ও মিলিয়ে গেল।

* * * * *

নারী-কল্যাণ সমিতি।

একটা ময়লা অন্ধকার গলির মধ্যে ভাঙা দোতালা বাড়ীর দোতালায়। ছোট্ট দরজার ওপর টিনের সাইন বোর্ড। তাতেই অস্পষ্ট লেখা আছে 'নারী-কল্যাণ সমিতি'।

নন্দিতা তার সামনে দাঁড়াল। সামনেই দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকলেই অন্ধকার সিঁড়ি। ভেতরে গভীর অন্ধকার, কি আছে কেউ জানেনা। রহস্যাবৃত। এর ভেতরেই আছে হয়ত হাজার হাজার নন্দিতার অন্তিম শয্যা। পরিচরহীন সন্তানদের পরিচর্য্যা, কিন্তু আর কি ?

নন্দিতা কি ভাবল দরজায় দাঁড়িয়ে।

দোতালা।

দরজা বন্ধ। প্রথম দিনের পালিশ কয়েক জায়গায় আজও আছে নতুনের সাক্ষ্য হয়ে। ধারে ধারে চুণ বালী খসে গেছে। অন্ধকারের অনন্ত রাজত্ব। সভয়ে নন্দিতা কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিল, ঝি।

"কাকে চাই বাছা ?" কথায় তার অশ্লীলতা, দৃষ্টিতে অসভ্যতা।

সঙ্কুচিত হয়ে নন্দিতা বললে "কে আছে ?"

একটু মুচকি হেসে, ঘাড় বেঁকিয়ে ঝি বললে—"বুঝতে পেরেছি, এস !"……

নন্দিতা ভয়ে জড়সড় হয়ে উঠল, ঘেমে গেছে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; মন্ত্র চালিতের মতন তার পেছনে পেছনে ঢুকল ভেতরে ; স'রে দাঁড়াল কোণে। ঝি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরের পৃথিবীর আলো, বাতাস, শব্দ, কিছু যেন ভেতরে না আসতে পারে !

ময়লা একটা ঘর ; অন্ধকার। পচাগন্ধ চারিদিকে যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। দেয়ালে দুখানা ছবি, একটা ফ্রেমে কাঁচ নেই ; ময়লা পড়ে আর ঝুলে ছবি দুটোই অস্পষ্ট। একধারে ছোট একটা খাট ; তার ওপর ময়লা বিছানা, চাদর নেই, তোষকটাতে যেন তেল কাদা প্রলেপ।

সামনে জানলা, বন্ধ। বাতাসে যেন বিষ মেশানো আছে। নন্দিতা এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল।

কোণে একটা ভাঙা টেবিল। সামনে তার চেয়ার, পেছনের দিকটা ভাঙা। নন্দিতা জানলাটা খুল্‌তে চেষ্টা করল, পারল না। জমে গেছে ময়লাতে আর ধূলো-বালিতে। ঝি ঘরটা দেখিয়ে বল্লে,— "বস বাছা এই ঘরে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অন্ধকার সেঁৎসেতে ঘরে ঢুকতেই নন্দিতার মনে পড়ল ও যেন রুগ্না, বিছানায় শুয়ে আছে আর বাবা ওকে ফল দিচ্ছেন পরম আদরে ! ও মুখ বেঁকিয়ে বলছে আর খাবনা, ভাল লাগেনা।

পিতার শিশুসুলভ আব্‌দার, অভিমান !

আজ কোথায় তিনি ?

নন্দিতার যেন মনে হল, ঘরের চারিদিকে তাঁর আত্মা ওকে ঘিরে কেঁদে মরছে !

অবসন্নের মতন বসে পড়ল বিছানার ওপর, তোষকটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল, যেমন করেই হ'ক কান্নাকে ও রোধ করবেই করবে।……

সন্ধ্যার অন্ধকার বাড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠেছে আলো। আকাশে জ্বলে উঠেছে একটি দুটি তারা। থমকে থমকে মৃদু ভেসে

আসছে বাইরের কোলাহল। অস্পষ্ট ; আবছায়া। বহুদূরে যেন কেউ গুমরে গুমরে কাঁদছে।

শাঁখ। কোন গৃহস্থ বধূ হয়ত বিশ্বের মঙ্গলকামনা করে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালল। গৃহস্থ বধূ ; স্বামী হয়ত এখনও ফেরেনি। হয়ত প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের হৃদয়ের গভীর অন্তস্থলে লুকায়িত একটিমাত্র বাসনা গোপনে নিবেদন করে দিল দেবতার পায়ে······এবার, একটি ছেলে······

আর ও, নন্দিতা?······

হঠাৎ চমকে উঠল। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল অসহায়া নারীর আকুল চীৎকার। কান্না নয় চীৎকার নয়, সে যেন জীবন-মরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর কাছে শেষ নিবেদন! থেকে থেকে সেই শব্দ ; মর্ম্মন্তুদ গোঙানির শব্দ······

নন্দিতা থাকতে পারল না। দেওয়ালে কান পাতলো!

মর্ম্মভেদী আর্তনাদ, নন্দিতার মাতৃহৃদয় ভেদ করে তা ছুটে গেল বহুদূরে।

কে শুনলো তা? কার কানে পৌছোল তা? বাইরে পৃথিবী আপনশব্দে বধির, সেখানে সভ্যতার গর্জন, জনতার চীৎকার, বেঁচে থাকবার তুমুল সংগ্রাম। সেখানে কি পৌছোয় এই বেদনার সকরুণ আবেদন!

অস্পষ্ট গোঙানি শুধু। আরও মর্ম্মন্তুদ, আরও বেদনাময়।

তাও ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল।

'এই যে' বলে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি পুরুষ নয়, পুরুষাকৃতি নারী। বয়স তিরিশ, দেখতে কদাকার। কাল', মোটা, বেঁটে, কোক্‌ড়া চুল, গোল গোল হাত-পা, মুখ, নাকটা একটু চাপা। চোখ দুটো কাল মার্বেল!

এরকম ধরণের মেয়েদের দেখা পাওয়া যায় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী
মহলে, পাড়াগাঁয়ে ক্ষ্যেন্তি পিসীদের দলে কিম্বা বাড়ীউলিদের আড়তে।
সচরাচর এদের নাম হয় মোক্ষদা সুন্দরী, কি জগন্মাতা, কি কামাক্ষ্যা-
সুন্দরী ; এঁর নাম সুন্দরীমোহিনী দাসী। পিতামাতার দল আপত্যস্নেহে
এমনিই অন্ধ হয়ে থাকেন! ইনিই নারী কল্যাণ-সমিতির অনারারি

সেক্রেটারী, অবৈতনিক ধাত্রী ও ডাক্তার। এঁর বাহন হলেন যে বিধবা দরজা খুলে দিয়েছিল। পরে জানা যাবে নাম তার ক্ষ্যান্তমণি।

নন্দিতা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল।

সুন্দরীমোহিনী অসভ্যের মতন নন্দিতার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে একটু মুচকী হেসে বললে "কিছু হিসেব আছে?"

নন্দিতা নিরুত্তর।

'বুঝেছি' সুন্দরীমোহিনী তার সেই মার্বেলের মত চোখদুটো ঘুরিয়ে অশ্লীলভাবেই বলে চলে 'লজ্জা', তা আমাদের কাছে লজ্জা কি বাছা?

কথাটা ঘোরাবার জন্যে নন্দিতা বল্লে "পাশের ঘরে কে গোঙাচ্ছে, অসহ্য ওর চীৎকার!"

'প্রথম পোয়াতি, বয়স বেশী, তাই;—তা তোমার অত কষ্ট হবেনা—তারপরে কি জান', তোমার ভাগ্য আর আমার হাতযশ" থেমে সুন্দরীমোহিনী আবার কি বলতে চাইছিল, নন্দিতা বাধা দিয়ে বল্লে, "কতটাকা তাত' বললেন না!"

সুন্দরীমোহিনী চটে গম্ভীর হয়েছিলেন, টাকার কথায় তেলে-বেগুনে হয়ে উঠলেন, বললেন, "টাকা ত এখানে লাগে না, শুধু খাইখরচ বাদে মাসিক তিরিশ আর ঝিয়ের মাইনে গোটা দশ। তাছাড়া নিজের কাপড় জামা ইত্যাদি বাবদ আরও গোটা দশেক—এই পঞ্চাশই ধর, তার বেশী নয়, আর তার বেশী চাইলেই বা দেবে কোথা থেকে!"

নন্দিতা ব্যাগ খুলে পাঁচটা দশ টাকার নোট দিচ্ছিল, দরজা দিয়ে উঁকি মারল বিধবার মুখখানা—চোখ দুটো তার জ্বল্ জ্বল্ করছে। সুন্দরীমোহিনী ওর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে টাকা গুণছিলেন, বিধবার দৃষ্টি যেন চাইছিল তা ভেদ করে টাকার কাছে পৌছতে।

গোণা শেষ করে সুন্দরীমোহিনী বললেন "টাকার কথা কাউকে বোল না, কম টাকায় সারলাম, শুনলে আমাকেই জবাবদিহী করতে হবে।"

গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকল বিধবা।

নাগিনীর মতন ফোঁস করে উঠে সুন্দরী বলে উঠল, "তোমার আবার এখানে কি চাই ক্ষ্যান্ত! ওঘরে থাকতে বললাম যে, কথা কি একটাও কানে ওঠেনা!" বিধবা শান্তভাবেই উত্তর দিল, "কাজের কথা মা, তাই বলতে এনু, একটু বাইরে আসুন দিকি!"

দরজার আড়ালে, ইঙ্গিত করে, ফিস্ ফিস্ করে বিধবা স্থন্দরী-মোহিনীকে যা বললে তা যে সাধারণ কথা কিছু নয়, বোঝা গেল স্থন্দরীমোহিনীর চেহারার চকিত পরিবর্ত্তন দেখে।

ছোটরা ভূত দেখলে এত ভয় পায় কিনা সন্দেহ। কোন রকমে ছুটতে ছুটতে স্থন্দরীমোহিনী অদৃশ্য হয়ে গেল। উঁকি মেরে তার চলে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে, সদর্পে ঘরে ঢুকে নন্দিতার নাকের কাছে হাতটা নেড়ে বিরক্ত হয়েই ক্ষ্যান্তমণি বললে, "আজকালকার মেয়ে হয়েছ বাছা, জ্ঞান-গম্যি কি কিছু হয়নি ? ফস্ করে অতগুলো টাকা উপুড় করে দিলে !—বলিহারী তোমাদের বুদ্ধি ! নেকাপড়া শিখেছ অথচ লোক চিনতে শেখনি !"

নন্দিতা নিরুত্তর ; কোন কথা বলবার ভাষা সে খুঁজে পেলেনা, হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ক্ষ্যান্তমণির মুখের দিকে।

"কি রকম মেয়ে তুমি গা ?" ক্ষ্যান্তমণি মুখ নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে, কথাগুলো কি কানে গেল না,—"বলি হ্যাঁ গা মেয়ে, অমন হ্যাঁ করে দেখছ কি ?—এখনও ভাল চাওত ফিরিয়ে নাও টাকাগুলো !"

ওঘর থেকে ডাক এল'—"ক্ষ্যান্ত !"

স্থন্দরীমোহিনীর গলা ; মুখ বিকৃতি করে ক্ষ্যান্ত আপন মনেই চেঁচিয়ে উঠল ; "আর পারিনিকো বাপু, ওনার কথায় ওঠ্-বস্ করে গতরে ঘূণ ধরল ! এক মিনিট চোখের আড় হবার জোটি নেই, অমনি 'ক্ষ্যান্ত'—ক্ষ্যান্ত ! ক্ষ্যান্ত যেন কারো কেনা দাসী !"

প্রকাশ্যে বললে "যাই গো !" যাবার কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না। আপন মনেই ক্ষ্যান্ত বলে চলল' "যা বলি মন দিয়ে শোন, এই করতে করতেই গতরে পোকা পড়ল ! তোমরা সব ভাল মানুষের মেয়ে পিছলে পড়েছ !—তা না হয় পড়লে, তা এখানে মরতে এসেছিলে কেন ? কোল্লেন সমিতি— না কোল্লেন আমার মাথা ! এই আমার কথাই বলিনা কেন—আমিও ত তোমার মতই একদিন এসেছিলাম, কৈ দিলে তারপর যেতে ?—

ক্ষ্যান্তমণি চুপ করল। ঘরখানা যেন হঠাৎ জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেললো। নন্দিতা বাইরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। নীহারিকার ভীড় ভেদ করে দৃষ্টি ওর ছুটে চলে গেছে কোন সুদূর

দিগন্তে! দেখলে ওকে মনে হয় যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়, শাপভ্রষ্টা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা······

কিন্তু পৃথিবীর চিহ্ন পড়েছে গালে; দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েও পড়ছেনা! ক্ষ্যান্তমণি নির্বাক। কি ভাবছে ও?

ক্ষ্যান্তমণি ভাবছে না, ভাবছে ও হারিয়ে যাওয়া মাতৃত্ব। ক্ষ্যান্তমণি ঝি, লোক চক্ষুতে ও বিধবা, কিন্তু সবার ওপরে ও নারী, ও মা। ওর সেই মাতৃহৃদয় ভাবছিল। ভাবছিল ওর নিজের মেয়ের কথা। যদি ছ বছর আগে সুন্দরীমোহিনীর প্ররোচনায় নিজের মেয়েকে একটা মাতাল লম্পটের হাতে তুলে না দিত তাহলে আজ হয়ত' সেও নন্দিতার মত সুন্দরী স্বর্গীয়া হত!

কেন, কেন মনে পড়ল ক্ষ্যান্তমণির এই সব কথা,—তার মাতৃহৃদয় কেন জেগে উঠল এমনি করে হাজার বছরের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে। কেন প্রকাশ চাইল ক্ষ্যান্তমণির সেই আপত্যস্নেহ, নারী হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, যা মরে গেছে!

ক্ষ্যান্ত আবার মুখর হয়ে ওঠে, বলে পেটের বাছাকে আসতে দাও, তোমার মুখ দেখে বুঝেছি, মন তোমার মরেনি, ছেলেপুলে পাপ নয়, দেবতার আশীর্বাদ!

ক্ষ্যান্তর ভাষায় যা প্রকাশ পেল, ওর বলার ধরণে প্রকাশ পেল অনেক বেশী! ওর অন্তর থেকে কে যেন ডুকরে কেঁদে নন্দিতার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—

পালাও! পালাও! পালাও!······

ক্ষ্যান্ত যেন নির্বাক ভাষায় চেঁচিয়ে বল্লে, পালাও! পালাও! পালাও······ওর দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল মাতৃত্বের শেষ কথাটি···আসতে দাও, তোমার কোল জুড়ে তাকে আস্‌তে দাও!······

ক্ষ্যান্ত চুপ করেছে; নন্দিতা অঝোরে কাঁদছে।

বাইরে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। তারায় তারায় চলেছে নিস্তব্ধ ভাষায় দুর্বোধ কথাবার্তা। ময়লা কাঁচের মধ্যে দিয়ে নন্দিতা তাই দেখছে; ওর চোখের জলে সে দৃশ্য আরও অস্পষ্ট, আরও মলিন······

পাশের ঘর থেকে ক্ষীণ শব্দ আসে "জল"······

আবেদন। মিনতি। অনুনয়। আর হয়ত শান্তি……

নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভয়ার্ত চীৎকার "ক্ষ্যান্ত—"

"ঐ রে" বলেই ক্ষ্যান্ত অদৃশ্য হয়ে গেল…

নন্দিতা চমকে উঠল।

পাশের ঘরের মেয়েটি সত্যি মারা গেল। কিন্তু কি হল তাতে? পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি, স্বার্থপর হীন পুরুষের কতটুকু ক্ষতি হল তাতে?

মহত্ব?—পুরুষ কি বোঝে তার? পুরুষ কি বুঝবে তার ক্ষণিকের উত্তেজনায় নারীর জীবনে সে কি দেয়! কি বুঝবে পুরুষ, পুরুষত্বের যেখানে শেষ, নারীত্বের সেখানে আরম্ভ।

কিন্তু তবু নারী পুরুষের সব দুর্বলতাকে ক্ষমা করেছে… নন্দিতা ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল'।

দরজা। অন্ধকার সিঁড়ি। নারী কল্যাণ সমিতির জীর্ণ দীর্ণ সাইন-বোর্ড…পথ…

সামনে ফুটের ক্ষীণ আলো, রাস্তার মোড়ে নির্মম অন্ধকার… আবার নন্দিতার পথ চলা।

পেছনে পড়ে রইল নারী কল্যাণ সমিতি সমাজের হিত সাধনের মুখোস পরে। পড়ে রইল সুন্দরীমোহিনী, অবৈতনিক সেক্রেটারী ও ধাত্রী। পড়ে রইল ক্ষ্যান্তমণি, মাতৃত্ব তার হয়ত আবার পড়েছে ঘুমিয়ে।

মোড়ে গিয়ে পেছন ফিরে একটু থামল নন্দিতা, পেছন ফিরে দেখল' নারী কল্যাণ সমিতির সামনে ভীড়…

মোড়ের অন্ধকারে নন্দিতা মিলিয়ে গেল।

* * *

ল্যাব থেকে ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী যখন বাড়ী ফিরলেন, সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা। এত তাড়াতাড়ি উনি কোনদিনই ফেরেন না, কিন্তু আজ যে কেন ফিরলেন তা উনি নিজেই বুঝতে পারলেন না।

রোজকার বিকেলের সঙ্গে আজকের বিকেলের কিছু প্রভেদ ছিল। কাজের মধ্যে বারবারই যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়ছিলেন। কর্ম্মময় জীবনের মাঝখান থেকে একটা বিরাট শূন্যতা মাথা নাড়া দিচ্ছিল।

টগ্‌বগে ফুটন্ত নানান রকম ওষুধের শব্দে একটি কথাই যেন ফুটে বেরোতে চাইছিল—তুমি কোন পথে ?

ঠিক এই কথাই বিকেল বেলা, টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে টেষ্টটিউবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী ভাবছিলেন।

"তিনি কোন পথে ?"

আজ ক্রমাগত তিরিশ বছর তিনি এমনি ভাবে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে, 'বিকার' হাতে, কেমিক্যালের টগবগানির মাঝখানে, তাঁর জীবনের প্রতিটি সন্ধ্যা কাটিয়েছেন। পরপর তিরিশটি বসন্ত তাঁর ল্যাবের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে, কেঁদে, ফিরে গেছে, পর পর তিরিশটি বর্ষা তার বিরহ নিয়ে, পর পর তিরিশটি শরৎ তার মেঘ ছায়ার খেলা নিয়ে। কিন্তু কেমিক্যালের মোহ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। স্ত্রীর কান্না, অভিমান, রূপ, সৌন্দর্য্য, যৌবন, সব বিফল হয়েছে : বিফল হয়েছে সমাজের মধুর অহ্বান, বন্ধুত্বের আকর্ষণ !

বিফল হয়েছে কণিকার যৌবন, তার কামনা, বাসনা।

আজ বার বার এই কথাই তাঁর মনে, হতে লাগল !

ল্যাবের মোহে তিনি জয় করেছেন স্নেহ, ভালবাসা, সংসারিক মায়া, মমতা, যশ, অর্থ, এমন কি পিতৃত্ব !

কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে ? জীবনে কি দিয়েছে তাঁকে তাঁর সাধনা ! মরিচিকার মতন জ্ঞানের পেছনে বৈজ্ঞানিক তিনি ছুটে গিয়েছেন, মানুষ তিনি কি পেয়েছেন তাতে !

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর কঙ্কাল আজ এই কথাই বার বার ভাবছে ! পুরুষত্ব তাঁর চেঁচিয়ে উঠে যেন বল্লে কিছু না, কিছু না, কিছু না।...... হাত থেকে টেষ্ট টিউবটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। তাঁর পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল কেমিক্যাল।

চরণে লুটিয়ে সে যেন কেঁদে কেঁদে বলছে : রেহাই দাও।...কোথায় যেন শূন্যতা, কিসের যেন অভাব।

আজ হঠাৎ নতুন করে মনে পড়ল কণিকার কথা। সেদিন পার্টির পর কণিকা তার অপরিপূর্ণ যৌবনের ক্রন্দন দমন করতে না পেরে যে কথা বলেছিল ডাঃ চৌধুরীকে, আজ আগুনের হল্‌কার মতন সেই কথাগুলো নতুন করে বিষ ঢেলে দিল ওঁর কানে। সত্যই ত', কি

পেয়েছে কণিকা? স্বামী পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আর কি? তার যৌবন ছুটে এসেছিল সমস্ত দেহে বন্যা বইয়ে দিয়ে, দু'হাতে পুরুষের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু শূন্য হাতে সে ফিরে গেছে। কে দায়ী তার জন্যে?

কণিকা যে এমনি করে ছুটে চলেছে কামনার আগুন জ্বালিয়ে চারিদিকে, তার জন্যে দায়ী কে—

আজ যে-সমস্ত শিশুর দল বাড়ীটা তাদের কলোচ্ছ্বাসে মুখরিত করে তুলতে পারত, যারা কণিকার জীবনে এনে দিতে পারত শত, সহস্র বৎসরের পূর্ণতা, যারা কণিকাকে দিতে পারত তার সব কিছু, তারা আসেনি কেন?

কে দায়ী তার জন্যে!

স্ত্রী কণিকা, নারী কণিকা, মা কণিকা, কিন্তু সব তার গেছে বিফলে, কেন, কেন, কেন?···

ওপাশে টেবিলের ওপরে গ্যাস, প্লানটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। হাজার কণিকার হাজার হাজার অতৃপ্ত আত্মা আজ যেন সমগ্র ল্যাবে ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে দিল।

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী; বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, সাধক, তাঁর গবেষণা, অধ্যাপনা, সাধনা···সবাই যেন মিলিত অভিযান চালাল ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর ঃ পুরুষত্বের ওপর।

আজ তাঁর পরাজয়, শোচনীয় পরাজয়!

সামনের টেবিলটা উল্টে ফেলে দিলেন ডাঃ চৌধুরী। একটা বিশ্রী আওয়াজ করে সেটা গড়িয়ে পড়ল মেঝে।

নিয়তি ক্রুর অট্টহাস্যে ব্যঙ্গ করল।

অসহ্য, অসহ্য এই ল্যাব আর তার সাজ সরঞ্জাম।

শত শত কণিকার অভিশাপ, শত শত শিশুর ক্রন্দন, শত শত বসন্তের হতাশ, বর্ষায় বিরহ, আজ তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

পরাজয়। পরাজয়। পরাজয়।

পুরুষের কাছে সাধকের পরাজয়। পৌরুষত্বের কাছে জ্ঞানের পরাজয়।

ছুটে বেরিয়ে পড়লেন পথে

আলো অন্ধকারের লুকোচুরি চলেছে আকাশে বাতাসে। বিদায় নেওয়া সূর্য্যের শেষ চুম্বন তখনও মিশিয়ে যায়নি পৃথিবীর বুক থেকে। রেশ আছে, আলোড়ন আছে, আর আছে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্নতা। দিনের এই সময়টাই যেন সব চেয়ে সুন্দর; বিরহের আবেশ মাখা তরুণীর দৃষ্টি যেন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। জীবনের শূন্যতা, যৌবনের হাহাকার, অপরিপূর্ণ মাতৃত্ব, অতৃপ্ত নারীত্ব, সবাই যেন এই সময়টিতে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করে।

মন্ত্রচালিতের মতন, প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের বাড়ীর গেটের সামনে এসে দেখলেন বাড়ী অন্ধকার।

তাহলে কণিকা বাড়ী নেই!

বাড়ীটা খোলাই থাকে; নিঃশব্দ চরণে বাড়ী ঢুকলেন। আজ কে যেন টেনে নিয়ে গেল ওঁকে রান্নাঘরের দিকে। কোনদিনও উনি যান না ওদিকে; উনিও না, কণিকাও না; কিন্তু আজ ওর মধ্যে কে যেন জেগে উঠেছে, ওকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দিক্‌বিদিকে!

রান্না ঘরে আলো জ্বলছে, আর···

অন্য দিন হলে চাকরটাকে আর ঝিটাকে বোধ হয় উনি গুলি করে মারতেন, আজ ক্ষমা করলেন! ক্ষমা করলেন, উনি নয় ওঁর অতৃপ্ত পুরুষ আত্মা!···

আজ ওরা চাকর আর ঝি নয়, পুরুষ আর নারী···

তেমনি নিঃশব্দে উনি আবার এসে দাঁড়ালেন পথে,···উন্মুক্ত আকাশের তলায়!···

আবার ছুটে চলা।···

কিন্তু কোন দিকে?···

যে দিকে হ'ক, যেখানে হ'ক, এই কামনা-বাসনা-পূর্ণ সংসারের বাইরে এমন কোথাও যেখানে গেলে রেহাই পাওয়া যায় নিজের অতৃপ্ত আত্মার কাছ থেকে, কণিকার কাছ থেকে, সংসারের কাছ থেকে, সাধনার কাছ থেকে, ল্যাবের কাছ থেকে।···

পৃথিবীর কাছ থেকে।

কোথায়? কেমন করে? কে রেহাই দেবে ওঁকে?

নিজের অজান্তেই গিয়ে দাঁড়ালেন যে বাড়ীর সামনে, সেটা রতিনের বাড়ী। চোরের মতন নিঃশব্দে ঢুকলেন ভেতরে। সুর্কির রাস্তা বাঁচিয়ে, ঘাসের উপর দিয়ে!···

সামান্য বাগান, তারপরই বারাণ্ডা, তারপরেই ড্রইং রুমের দরজা, সামনেই ড্রইং রুম, দক্ষিণদিকে ষ্টাডি, এবাড়ী আর্টিষ্টের তাই···ষ্টুডিও।

ড্রইং রুম অন্ধকার, ষ্টুডিওতে জ্বলছে আলো। নীল রঙের। জানালা দিয়ে বাইরে সুর্কির রাস্তা পেরিয়ে আলো পড়েছে ঘাসের ওপর! প্রথম দেখলে মনে হয় বুঝি চাঁদের আলো, পূর্ণিমা রাত্রে।

জানলার ধারে শিউলির ঝাড়, ফুল ফুটেছে থরে থরে।

নিঃশব্দে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ডাঃ চৌধুরী: ঠিক চোরের মতন, কোন শব্দ না করে, এমন ভাবে যাতে কেউ না পারে জানতে। এমনিই হয় জীবনের অপরিপূর্ণতা; এমনিকরেই মানুষকে করে চোর, মাতাল, বদমায়েস, খুনে।···

ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে নীল। সামনে ইজেল্। ইজেলের ওপর প্রকাণ্ড ছবি। নারী মূর্তি। অসংলগ্ন বস্ত্রের অসামঞ্জস্যতায় অর্দ্ধনগ্নতা পরিস্ফুট। এলায়িত কেশ। লজ্জাবনত আঁখি দুটি অর্দ্ধ নিমিলীত। অর্দ্ধ উন্মোচনে যৌবনের ছোঁয়াচ। গাল দুটি লাল টক্টকে, রঙে রঙে, দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে, কানায় কানায় ভরে উঠেছে দুই কূল। শিল্পী দাঁড়িয়ে সামনে, তুলি দিয়ে রক্তিম বিন্দু ফুটিয়ে তুলছে স্তন যুগলের ওপরে, সযতনে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নববধূর যেন সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু আঁকা। আর ওপাশে, কণিকা। সে মডেল।

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীকে দরজার ঠিক পাশটিতে কে যেন দাঁড় করিয়ে রাখলে, ভেতরে ঢুকবার সাহস নেই: অধিকার নেই।

এরাও আজ···রতিন সেন নয়, কণিকা চৌধুরী নয়··· এরা আজ শিল্প ও শিল্পী, এরা আজ প্রেমিক প্রেমিকা, এরাও আজ পুরুষ আর নারী······

তেমনি নিঃশব্দে ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী নেমে এসে দাঁড়ালেন, পথে··· এই ত জীবন, এইত নারী, পুরুষ, সংসার, স্নেহ, ভালবাসা, ··এইত নারীত্ব, যৌবন···

আবার ফিরে চললেন···

প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে জোরে, তারপর ছুটতে ছুটতে··· যেখানে হ'ক, যেদিকে হ'ক, পৃথিবীর কোলাহলের বাইরে, এমন যায়গায় যেখানে নেই সংসারের ভালবাসার প্রহসন, যৌবনের অত্যাচার···

নিজের অজান্তেই ডাঃ চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন লেবরেটারীর দরজায়। সশব্দে বন্ধ করে দিলেন ল্যাবের দরজা।

আবার কেমিক্যাল, টেষ্ট, টিউব, বার্ণার, পাপেট, বিকার, গ্যাস···

অ্যাকসান রি-অ্যাকসান······

আবার কাজ।

কাজ। কাজ। কাজ।···

কাজের মধ্যে আজ ভুলে থাকবেন সব, ভুলে যাবেন জীবনকে, যা পাননি, তাকে ; যা দেননি, তা ; অভাব, নারী, যৌবন, বসন্ত, স্নেহ ভালবাসা, স্ত্রী, সব······

আবার বার্ণার জ্বলে উঠল, আবার কেমিক্যাল ফুটতে আরম্ভ হোল, আবার বিজ্ঞানের ছল-চাতুরী আরম্ভ হ'ল······

আবার সেই অদ্ভুত শব্দ।

আবার এনালিসিস্, গ্যাস তৈরী, রিটর্ট, বেসিন, অ্যাসিড, আলকালি···কিন্তু সব প্রাণহীন, ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী আজ মানুষ নন, তিনি কলের পুতুল, মন তাঁর ছুটে চলে গেছে সেইখানে, যেখানে বিক্ষুব্ধা নারী আর প্রেমের এবং শিল্পেরপূজারী পুরুষ রাসলীলা করছে যৌবনের পিচ্‌কারীতে, সেইখানে···

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাই ভাবছিলেন ডাঃ চৌধুরী ; অন্যমনস্ক······

হাত থেকে জলের বিকারটা পড়ে গেল সামনের কেমিক্যালগুলোর ওপর—শব্দ। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহরখানা একবার যেন কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্যে। গভীর নিশীথে একবার যেন সমস্ত সহরটা ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরল। একটিমাত্র শব্দ, দেবতার যেন কোপাগ্নি বর্ষিত হল। বিদ্যুতের মতন উজ্জ্বল আলোতে ল্যাবটা ঝলসে উঠে অন্ধকারের অতল সমুদ্রে ডুবে গেল।

তার পর ?

নিশীথ রাত্রে যখন ডাঃ চৌধুরীর জ্ঞান হ'ল তখন সামনে তাঁর গভীর

অন্ধকার। একলা ঘরে শুয়ে তিনি অনুভব করলেন, চোখের ওপর তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কপালের ওপর ডানদিক ঘেঁষে, অসহ্য যন্ত্রণা। ডান হাতখানায় ব্যাণ্ডেজ।

কণিকা তখন ছুটন্ত ট্রেনে রতিনের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে; চোখে তার আধো জাগ্রতের আবেশ, দেহ তার শিথিল।···

রতিন ওর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বলছে অসংলগ্ন কত কথা, আবছায়া তার উত্তর।

ভয় করছে?

না! তুমি আছ পাশে, ভয় আমার কি?

যদি ফেলে পালাই?

পথ নেব করে, যৌবন আছে, উগ্রতা আছে রূপের, পালিস্ আছে শিক্ষার।

ডাক্তার কি ভাবছেন?

চিঠি পাবেন কাল সকালে? তখন আমরা চলে গেছি অনেক দূরে, আগ্রার কাছাকাছি······

কি করবেন তিনি চিঠি পেয়ে?

আফ্‌শোস্! জীবনে যা হারালেন, তার জন্যে দুঃখ, হয়ত সববেদনা, আমার জন্যে হয়ত অনুকম্পা, নয়ত ঘৃণা!

আর ওরা? ওরা হয়ত তখন মর্মর স্বপ্ন তাজের সামনে দাঁড়াবে হাত ধরাধরি করে, মুখে থাকবে না কোন কথা, আকাশে বাতাসে ভাববে ভৈরবীর কোমল রেখাবের সুর; সেই সুরে সুর মিলিয়ে মমতাজের বিরহী আত্মা কি বলবে না কণিকার কানে কোন কথা? বলবে, বলবে, মমতাজ বলবে কণিকাকে; বলবে অভাগী, যাকে ফেলে এলি, তাকে চিনলি না কেন? সে ত তোকে অবহেলা করেনি, সে সাধনায় নারীকে চেনেনি··· দাবী করলে পেতিস তোর প্রাপ্য—সে ত নারীত্বকে জাগিয়ে দিত, তোর মধ্যে ঘুমন্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে দিত!···আর সাজাহান। সেও বলবে রতিনকে, বলবে অভাগা পুরুষ, পুরুষের কাছ থেকে নারীকে ছিনিয়ে আনলে, কি দেবে তুমি তাকে? পুরুষ নারীকে যা দিতে পারে, তুমি কি দেবে তাকে তার চেয়ে বেশী কিছু? দেবে? পারবে দিতে?

তার পর রতিন চাইবে কণিকার দিকে, কণিকা চাইবে রতিনের দিকে, দুজনে দেখতে চাইবে দুজনকে দুই দৃষ্টিতে, কিন্তু যে দৃশ্য ওদের দুজনের দৃষ্টিতেই ভাসবে একই সময়, তা, ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর প্রশান্ত মূর্তি !

কিন্তু কেন তার জন্যে এত মায়া, যাকে ওরা দুজনেই পেছনে ফেলে এসেছে। তাকে ত ওরা ভুলবে বলেই এমন করে পালিয়ে এসেছে ! কেন তবে এই মায়া ?

রতিন ভাববে, কণিকাকে ছিনিয়ে এনে কি দিয়েছে ও, কি এমন জিনিষ ও দিতে পেরেছে, যা ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী দিতে পারেননি ?

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ?—কণিকা তা কোন দিনও দাবী করেনি, অভিমানে অন্ধ হয়ে ও নিজেকে ক্ষয় করেছে তিলে তিলে !

ভালবাসা ?—কে বলতে পারে, হয়ত ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর নিরবতার মধ্যে আছে ভালবাসার যে মহান আদর্শ তা কণিকার মত নারীর বোধগম্য হয়নি, কিম্বা হয়ত ডাঃ চৌধুরীই হলেন ভালবাসার আদর্শ রূপ ! ভালবাসাকে দৈহিক মিলন দিয়ে যাচাই করা যায় না, দাম্পত্য বন্ধনকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় ! কণিকা হয়ত সেইখানেই নিজেকে ঠকিয়েছে।

আর কণিকা ! কণিকা হয়ত রতিনের কথায়, স্পর্শে, দৃষ্টিতে খুঁজতে চাইবে এমন কিছু যা ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর মধ্যে পায়ান। হয়ত ভাববে কিসের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ও এমনভাবে নিজেকে বাইরের পৃথিবীতে টেনে এনেছে ! কি দিয়েছে রতিন ওকে ! পুরুষের কাছে নারীর যা চিরাচরিত কাম্য,—তার ঘুমন্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে দেওয়া, এ ছাড়া রতিনের কাছে আর কি পেতে পারে ?

তবু রতিনকেই ও প্রশান্তর চাইতে বড় বলে মেনে নিয়েছে ! এমনি করেই নারী চিরদিন পুরুষকে ঠকায়।

তাজমহল তার সাক্ষ্য !

বিশ্বের সামনে তাজমহল দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের সমাধি হয়ে ; কিন্তু তাজমহলের প্রস্তরে প্রস্তরে যা লেখা আছে তা প্রেমের ইতিহাস নয়, নারীর লুণ্ঠন !

মমতাজ কি সিরাজীকে ঠকায়নি ? সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজরাজেশ্বরী হবার মোহে সে কি সিরাজীকে ঠেলে ফেলে দেয়নি বিস্মৃতির অন্ধকারে ?

অথচ ঐ বিরাট পাষাণের ভিত্তি আজ শিল্পী সিরাজীরই বিন্দু বিন্দু অশ্রুর ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মমতাজের সৌন্দর্য্য তাকেও ঠেলে ফেলে দিয়েছে বিস্মৃতির অতল গর্ত্তে!

মমতাজ কি সাজাহানকে ঠকায়নি? মমতাজ সাজাহানকে ভালবাসত না, ভালবাসত নিজেকে, নিজের নারীত্বকে, নিজের মাতৃত্বকে! সম্রাট সাজাহান মমতাজের সেই সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়েছিলেন বলেই, সে সম্রাটের সঙ্গে করেছিল ভালবাসার নিখুঁত অভিনয়!

নারী চিরকাল এমনি করেই পুরুষকে ঠকায়। পদ্মিনী এমনি করেই একদিন এনেছিল ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য, কত রাজা, কত রাজ্য এমনি করেই হয়েছে বিলীন!

তাজমহলও পুরুষের ধ্বংসের ইতিহাস—সাজাহান, সিরাজী এদের তিল তিল ধ্বংসের ইতিহাস।

তাই তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের মনে পড়বে প্রশান্ত চৌধুরীর কথা, তার ধ্বংসের কথা!

৭

তার পর আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে।

এই পাঁচ বছরে নন্দিতা অন্ততঃ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। নারী-কল্যাণ সমিতির পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে পথে বেরিয়ে ওর প্রথম মনে হয়েছিল ক্ষ্যান্তর কথা। ক্ষ্যান্ত অশিক্ষিত কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর, সে পঙ্কিলতার অতল গর্ভে ডুবে আছে, তাই তার মধ্যেকার অনন্ত নারী-প্রতিমা প্রকাশের পথ পায়নি, পেলে সে হত মাতা!

নন্দিতার অবস্থা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তার নিজের জীবনের স্বর্ণময় ক্ষণটিকে ; অলক্ষ্যে, সঙ্গোপনে, নিস্তব্ধ ভাষায় সে বলেছিল মাতৃত্ব পাপ নয়!

নন্দিতা মনকে তাই তারই আদর্শে বেঁধে নিলে।

ওর মধ্যেকার মাতৃহৃদয় আবার নতুন করে জেগে উঠল।

একবার ও ভাবলে প্রেমাঙ্কুরকে জানাবে, আর কিছু না হক অন্ততঃ

সামান্য অর্থ সাহায্য চাইবে! ওর বৈচিত্র্যপূর্ণ অনাগত ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন, অথচ জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে আছে মাত্র একশো টাকা···

'কিন্তু প্রেমাঙ্কুর'—নন্দিতা ভাবতে থাকে, প্রেমাঙ্কুরের কাছে কেন হাত পাতবে, আর সেই বা কেন সাহায্য করবে? নারীর জীবনে পুরুষের যতটুকু দান তা প্রেমাঙ্কুর অযাচিত ভাবেই ওকে দিয়েছে, ওর মাতৃত্বের জাগরণে ও হয়েছিল ঘুমভাঙান সুর, তার বেশী আর কি দিতে পারে প্রেমাঙ্কুর?

বিয়ে?

প্রেমাঙ্কুরকে ভালবাসা যায়, তাকে নিয়ে পিকনিক্ করা যায়, তাকে উপলক্ষ রেখে মাতৃত্বকে জাগরিত করা যায় কিন্তু আজীবন তাকে পাশে রেখে পথ চলা যায় না! জীবনের প্রতি মুহূর্ত তার পায়ে বিকিয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, বিয়ের কথা তাকেই বা বলবে কি করে? সন্তানের দোহাই দেবে? সন্তান ত নারীর, পুরুষ ত উপলক্ষ মাত্র—ক্ষণিকের উন্মাদনা!

সমাজের প্রতি দায়িত্ব?

কিসের সমাজ? যে সমাজ নারীকে প্রতি পদক্ষেপে অপমান করে সে সমাজকে নন্দিতা স্বীকার করে না, আন্তরিক ঘৃণা করে! তাছাড়া সমাজ কি? সমাজ হ'ল কয়েকজন বিকৃত চরিত্র পুরুষের হাতের খেলার পুতুল! সেই পুতুল নাচ দেখিয়ে তারা গরীব গৃহস্থদের ওপর অত্যাচার করে আর ধনীদের কাছে অর্থোপায় করে, এইত সমাজের প্রকৃত রূপ।

এই সমাজকে নন্দিতা স্বীকার করে না।

তাই মন থেকে নন্দিতা সম্পূর্ণ বাদ দিলে—প্রেমাঙ্কুরকে, বিয়ের কথা, আর সমাজের রক্তচক্ষু।

যেমন করেই হ'ক ও এগিয়ে যাবে।

সাহায্য ও কারো কাছে চাইবে না, নিজের নির্ভরশীলতার ওপর নির্ভর করে ও জয়লাভ করবে। ওর আত্মা, ওর আত্মজ শক্তি, ওর সাহস, এদের সাহায্য নিয়ে ও জয়লাভ করবে।

নন্দিতার মতন যাদের অবস্থা, তাদের দুটো পথ: হয়ত তারা লজ্জিত তাদের পদস্খলনের জন্যে, আর নয় তারা গর্বিত তাদের মাতৃত্বের প্রস্ফুরণে! নন্দিতা গর্বিত, লজ্জিত নয়!

কেন গর্বিত হবে না সে ? বনের মুক্ত বিহঙ্গমের মতন নীড় রচন করেছে আপন হাতে, অর্জন করেছে ওর শিশু ; তার জন্যে ও অবিরাম সংগ্রাম চালাচ্ছে জীবনের সঙ্গে—দারিদ্র্যের সঙ্গে, অন্নাভাবের সঙ্গে, সমাজের লোকলজ্জা কলঙ্কের সঙ্গে, পুরুষের বক্রদৃষ্টির সঙ্গে !

তার জন্যে ও তিলে তিলে আত্মোৎসর্গ করেছে !

মঝে মাঝে নন্দিতা পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে হয়ে ওঠে, সংগ্রাম থামিয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় ; কোথায় হারিয়ে যায় ওর আত্মা, ওর নারীত্ব, ওর মাতৃত্ব, শিশুর প্রতি ওর কর্তব্য।…

এমনি করে সকলের কাছে অপমানিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে ও পারে না নিজেকে সঞ্চয় করতে, চাই সাহস দেবার মতন সাথী, চাই উৎসাহিত করবার মতন ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী ; কিম্বা আর কাউকে ;…মাঝে মাঝে ওর ভয় হয়। এই অভাব অনটনের মধ্যে যে আসছে সে হয়ত হবে পঙ্গু, বিকৃত, স্বাস্থ্যহীন ; তার জন্যে…?

হক, তাই হক, তবু সে ওর সন্তান, ওর সমস্ত শিরা উপশিরার সাধনা সে, ওর জীবন, ওর মরণ !

অন্তরাল থেকে কে যেন বলে, না না, তা নয়, যে আসছে সে আসবে তোমার সাহস নিয়ে, প্রেমাঙ্কুরের সৌন্দর্য্য নিয়ে, বিশাল অন্তঃকরণ নিয়ে, সাধনা নিয়ে !

বিশালত্ব আর সাধনার কথায় ওর মনে পড়ে যায় আর একজনের কথা, ওর অন্তরের নিভৃত অন্তরালে, অত্যন্ত সঙ্গোপনে ব'সে যে পরমাত্মা ওকে সাহস দেয়, শক্তি দেয়, উৎসাহ দেয়…

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাধক, প্রকৃত পুরুষ…

নারীকল্যাণ সমিতি থেকে বেরিয়ে, নন্দিতা সোজা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল…একমাস সে ছিল কলকাতায়। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত তার কাজ ছিল চাকরির অনুসন্ধান করা আর ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা ! আর তিন দিনের মাত্র সংস্থান আছে—আর মাত্র তিন দিন, তারপর ওকে নাবতে হবে পথে, কপর্দকহীন, রাস্তার ভিখারীর মতন।

আর মাত্র তিন দিন…

নিয়তি ওকে নিয়ে যে এমন ভাবে খেলা করবে তা ও ভাবতেও পারেনি !

কার্জন পার্কে বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল আনমনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি পড়েছে চৌরঙ্গীর বড় দোকানগুলোর মাথার ওপর। লালচে আভা, যেন আকাশে বাতাসে একমুঠো সিঁদূর কে ছড়িয়ে দিয়েছে।

সামনে জনতা, সভ্যতার রঙে তারা রঙিন। নারী, পুরুষ, শিশু, মোটর গাড়ী, ট্রাম, সব মিলে যেন মেলা বসেছে।

বেঞ্চির ওপর বসে বার বার ওর একটি কথাই মনে পড়ছিল···আর মাত্র তিন দিন !

একটি যুবতী এসে দাঁড়াল পাশে। ভিখারিণী, কোলে শিশু, পয়সা চায়, তিন দিন খাওয়া হয়নি।

দান করবার মতন পয়সা নন্দিতার ছিল না, কিন্তু সযত্নে আবৃত শিশুটির মুখখানা ও দেখে ফেললে। মারি গুটিকায় মুখখানা ভরে গেছে। মুখখানা ফুলে উঠেছে, রোগের প্রকোপে. চোখ দুটি বন্ধ, মুখখানা দেখলে মনে হয় কাঁদতে কাঁদতে শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে। রমণীর দৃষ্টিতে পৈশাচিক আর্তনাদ, মর্মন্তুদ বেদনা।

তার দেহে পুরুষের পাশবিকতার কলঙ্কের রেখা, সে অন্তঃসত্বা, আর একটি শিশু আসছে।

মেয়েটি নির্বাক দৃষ্টিতে বলল আমার কেউ নেই, অন্নের একান্ত অভাব !

নন্দিতা শিউরে উঠল। ইতিমধ্যে কিছু যদি না জুটে যায় তাহলে তিনদিন পর ওর আর ভিখারিণীর মধ্যে থাকবে না কোন প্রভেদ।

এই ত জীবন ! এইত নারী ; আর এদের এমনি করে বঞ্চনা করে পুরুষ ? এদের এমনি করে লুণ্ঠন করে পথের পঙ্কিলতার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়। কোলে দেয় শিশুকে, যার না আসলে কোন ক্ষতি পৃথিবীর হ'ত না !

নন্দিতা ব্যাগটা তার হাতে তুলে দিয়ে ছুটে চলে যাবে, কিন্তু পারল না। ট্রাম, বাস, জনতা, দোকান, পুরুষ, নারী, সব কিছু যেন ওর চোখে এক হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার আলো, ভিখারিণী, তার মৃতপ্রায় শিশু···

মিলিয়ে গেল পৃথিবী···

অন্ধকার, বিরাট অন্ধকার।

তার সব কিছু!

যখন জ্ঞান হ'ল, ওর মুখের ওপর যে সতর্ক দৃষ্টি ও প্রথম অনুভব করল তা ডাঃ মিস্ গুপ্তার!

জিজ্ঞেস করলে, "কেমন আছ?"

"আপনি?" নন্দিতা বললে, "আমি এখানে কি করে এলাম?"

ব্যাপারটা নাটকীয়, বাংলা উপন্যাসের বাঁধা ধরা ছন্দ বলেই যেন নন্দিতার প্রথম মনে হল!

তা হ'ক, তবু ত সে আস্তানা পেয়েছে।

মিস্ গুপ্তা বললেন, "পরে শুনো, এখন চুপ করে শোও, এই রকম অবস্থা নিয়ে পথে পথে ঘোরা তোমার অনুচিত!"

নন্দিতা কোন কথা বলতে পারলে না। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল! কেন কাঁদছে নন্দিতা?

মিস্ গুপ্তা নিজে নিলেন পরিচর্য্যার ভার, নন্দিতাকে ছাড়বেন না! নন্দিতা তাঁর দয়ার বিনিময়ে ফেলছে চোখের জল! কিন্তু কেন? মিস্ গুপ্তার অন্তরের যে চিন্তা, যে কামনা, যে পরম সত্য নিহিত আছে তা তিনি নিজে বাস্তবতায় পরিণত করতে পারেন নি, নন্দিতার মধ্যে পেতে চাইছেন তার পরিপূর্ণতাকে উপভোগ করতে, তাতে তাঁর দয়ার প্রকাশ কোনখানে? পারতেন তিনি এমনি করে নন্দিতাকে সেবা করতে, যদি হ'ত সে টিবির পেসেণ্ট! পারতেন তিনি তাকে এমনি আদর করে বকতে?

কিছুতেই পারতেন না!

নন্দিতাকে তিনি ছাড়বেন না। নন্দিতাও কিছুতেই রাজী নয় অনুকম্পা সংগ্রহ করতে। অগত্যা ষাট টাকা মাইনের চাকরি হল নন্দিতার, কাজ হল মিস্ গুপ্তাকে সাহায্য করা। বলতে গেলে একরকম তাঁর পার্শ্বচর।

ওঁদের মধ্যে সম্বন্ধ রইল মনিব-ভৃত্যের; নন্দিতা তার বেশী দাবীও

করেনি কিছু, কিন্তু চিরন্তন নারী, মিস্ গুপ্তা তার আদরে যত্নে নন্দিতাকে ব্যস্ত করে তোলেন। নন্দিতা মৃদু অভিযোগ জানায়, উনি শোনেন না। নন্দিতা হ'ল ওঁর আদর যত্নের উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'ল সে যে আসছে। নন্দিতার মধ্যস্থতায় উনি তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চান!

এমন অনেক দিন হয়েছে, যখন উনি, ওঁর বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে কাজ করতে করতে আনমনা হয়ে পড়েছেন, হয়ত একদৃষ্টে চেয়ে আছেন কার্য্যরতা নন্দিতার দিকে।

কি ব্যগ্র তাঁর দৃষ্টি! সে দৃষ্টি নন্দিতাকে ভেদ করে চলে গেছে সেইখানে যেখানে শিশু ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে।

মাতৃত্ব এমনি ভাবেই নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয়, এমনি একটা উপলক্ষ নিয়ে, তার সম্পূর্ণ অজান্তে!

দৃষ্টি বিনিময় হয়, উনি লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি অপসারণ করেন!

নন্দিতা অস্বস্তি বোধ করে, লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, কাজের আছিলায় ঘর ছেড়ে পালায়, নিজেও রেহাই পায়, মিস্ গুপ্তাকেও রেহাই দেয়!

এ বিষয়ে কেউ কাউকে কোন কথা বলে না। আবার হয়ত এরকম হয়, প্রায়ই।

ক্রমেই যত নন্দিতার দিন ঘনিয়ে আসে, মিস্ গুপ্তার পরিচর্য্যার ভার ততই ভারী হতে থাকে। নন্দিতাকে কাজ কম করতে বলা, ফল মূল খাওয়ান, নিয়মিত বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, এমনি আরও কত কাজ উনি করেন। এমন কি শেষ কালে উনি নিজের প্র্যাক্‌টিস্ও এড়িয়ে যান। দায়টা যেন ওঁর নিজেরই বেশী! পারলে উনি বোধ হয় নন্দিতাকে রেহাই দিয়ে নিজেই সব করতে রাজী হন!

এমনি করে একদিন মিস্ গুপ্তার পরিচর্য্যায় জন্ম নিল নন্দিতার শিশু, তার একান্তে সাধনার মূর্তিমতি রূপ। সামাজিক হিসেবে পিতৃপরিচয়-হীন, সমাজের জঞ্জাল, নারীর কলঙ্ক, পুরুষের কিছু নয়, সেই শিশুপুত্র।

যার জন্যে নন্দিতা, নন্দিতা হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল, যার জন্যে তার আজীবন সাধনা, যার জন্যে তিলে তিলে নিজেকে দগ্ধ করা, জীবনের যা কিছু কাম্য সব বিসর্জন দেওয়া!

জীবনের সব শূন্যতা, অপরিপূর্ণতার শেষ যবনিকা টেনে দিল ওর

নবাগত পুত্র, এতদিন যে ছিল স্বপ্নলোকের কল্পনা কুমার, ওর জীবনের প্রতিমুহূর্তের কামনা, বাসনা !

মিস্ গুপ্তার কোলেই সে বড় হয়ে উঠল ।

দেখতে দেখতে বয়স তার চার বছর, মিস্ গুপ্তার দেওয়া নাম হল তার "আবীর" ।

আবীর নামের উপলক্ষ হ'ল ওর জন্মদিন । ফাগে ফাগে রঙে রঙে যখন রঙীন হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস, ফাগুয়ার গানে গানে মুখরিত হয়েছে ধরা, ঘন বসন্ত ঘেরা বকুল ছায়ার দখিণা পবন, যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, আবীর তখন নন্দিতার সমস্ত সত্বাকে দোলা দিয়ে উঠল । মিস্ গুপ্তা, ডাক্তারী চাকচিক্য, আভিজাত্য, সমাজের নির্দেশ, সমস্ত উপেক্ষা করে, ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন, আদরে আদরে ছেলেকে রাঙা করে নাম রাখলেন "আবীর" ।

শুধু আবীরের জন্মদিনের দোল পূর্ণিমা নয়, এ নামের পেছনে আছে আরও বহু পূর্ণিমার দোলের ব্যর্থ ইতিহাস, এমনি এক দোলের দিনেই ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল পিতৃবন্ধুর পুত্র অভ্রেন্দুর সঙ্গে ! বয়স তখন তার ছিল ষোলো কি সতের, বেথুনের ছাত্রী ।

তারপর পর পর সাতটি দোলপূর্ণিমা ওরা একসঙ্গে অতিবাহিত করেছিল, কিন্তু, তার পরের দোলপূর্ণিমায়, অভ্রেন্দু গেল বিলেত পূর্ণিমাকে বিয়ে করে, তার বাবার টাকায় ।

আবীরের নামের পেছনে সেই গোপন ক্ষণবসন্তের ইতিহাস সঙ্গোপনে রূপ পরিগ্রহ করল !

আবীবের যখন বয়স ছমাস তখন মিস্ গুপ্তা আবীর আর আবীরের মাকে নিয়ে স্বাস্থ্যান্বেষণে গেলেন দেরাদুনে, তাঁর বাবার কাছে । আবীরের মার স্বাস্থ্য হ'ল উপলক্ষ, আবীরই হল উদ্দেশ্য ।

মিস্ গুপ্তার বাবা রাসায়নিক বিজ্ঞানের নির্বাক সাধক । সংসারে তিনি মেয়েকে নিয়ে একা, থাকেন আপন কাজে, গবেষণার মধ্যে বিরাজ করেন যক্ষের মতন !

নাম তাঁর ডাঃ সোমেশ গুপ্ত । বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি ; স্ত্রীর মৃত্যুর পর আজীবন উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করে নিজের

ছোট্ট বাংলোর ধারেই গবেষণাগার তৈরী করেছেন। সেও আজ প্রায় পনের বছরের কথা।

অসম সহিষ্ণু, ধৈর্য্যবান্, মাথায় কিছু ছিট থাকা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি এই রোগ তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য অটুট নয়, ঠুন্‌কো। তাঁর ভয় হয়েছে, হয়ত তাঁর পরিশ্রম সফল হবার আগেই তাঁকে সমস্ত বিসর্জন দিতে হবে। কাজেই মরতে তিনি এখনও প্রস্তুত নয়! অথচ এই মৃত্যুর ভয় বিভীষিকার মতন তাঁকে পেয়ে বসে, উন্মাদের মতন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন! মেয়ে কলকাতা যাওয়ার পর থেকেই ওঁর পরিচর্য্যার অভাব হয়। স্বাস্থ্য, অনিয়মে, অত্যাচারে, আর অমানুষিক পরিশ্রমে ভেঙে গেছে।

এখানে এসে নন্দিতা মনের মতন কাজ পেল, আর আবীর পেল ছুটোছুটি করবার অবাধ স্বাধীনতা। মিস্ গুপ্তা বাবাকে নন্দিতার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবীরকে মানুষ করবার কাজে উঠে-পড়ে লাগলেন। কলকাতা ফিরে যাবার কথা, সেখানকার প্র্যাকটিস্, রুগী সব কোথায় উবে গেল; একমাসের জন্যে এসে, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল।

তারপর একদিন একমাসের অবসর নিয়ে নন্দিতা ভারতী-বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ নয়, অন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। মনের অত্যন্ত সঙ্গোপনে যে বিরাট পুরুষকে ও পুষে রেখেছে সেই প্রথমদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত' তার দর্শন।

ডাঃ চৌধুরীকে দেখতে।

পাঁচ বছরে পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে নন্দিতা আবার ভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় পা দিল।

কত পরিবর্ত্তনই না ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। প্রেমাঙ্কুর মিলিয়ে গেছে বিশ্বের জনতার মধ্যে! তারপর আরও কত প্রেমাঙ্কুর চলে গেছে, কেউ তার হিসাব রাখেনা। কত নন্দিতা এসেছিল, চলে গেছে!

বাসন্তীও আজ নেই। কে জানে সে কোথায় আছে। হয়ত পৃথিবীতেই নয়, কিম্বা আছে কারো সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে পুত্রকন্যা নিয়ে, স্বামীর ভালবাসার পরিপূর্ণতার মধ্যে। কিম্বা হয়ত ব্যর্থ জীবনকে টেনে নিয়ে চলেছে কোন' কাজের মধ্যে দিয়ে!

হয়ত অভিনেত্রী, কিম্বা শিক্ষয়িত্রী, কিম্বা—?

বিশ্ববিদ্যালয় আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অটল, পাষাণ! প্রাণের স্পন্দন আছে ছাত্রের কোলাহলে, তা নাহলে সে নির্জীব, নিস্তব্ধ, যেন পাষাণপুরী!

ঐত মেয়েদের হোষ্টেল, কল্পনায় দেখল তার নিজের ঘরটি, বিছানা, পড়বার টেবিল। বাসন্তী, তার কথা, হাসি, গান, মেয়েদের আপনহারা কলোচ্ছ্বাস, খাবার ঘরের হুড়োহুড়ি, মাতামাতি, আন্নাকালির অশ্লীল চাউনি, স্নো, পাউডার দিয়ে ঘষা অশ্লীলতার মুখ, হাসি, কাল কাল দোক্তা খাওয়া দাঁত, স্থূলাকৃতি চেহারা।

সব যেন ওর চোখের সামনে ভাসছে।

ইউনিভারসিটি টাউন। ঠিক তেমনি আছে। রাস্তার ধারে ধারে তেমনি ফুল ফুটেছে, গাছে গাছে পাখীরা ঠিক একই সুরে ডাকছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তেমনি দৌড়োদৌড়ি করছে।

রাস্তার এই কোণে দাঁড়িয়ে ও সেদিন কতই না কেঁদেছিল, যেদিন প্রথম ওকে রেখে ওর বাবা চলে যান। এইখানে দাঁড়িয়ে ধূলো উড়িয়ে চলে যাওয়া গাড়ীর দিকে চেয়ে ও কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। যেন এই মুহূর্ত্তের ঘটনা।

ঐ ত' সমরেশদার দোকান। আজও তেমনি ছোট্ট আছে, ঠিক একই জিনিষ নিয়ে। চকোলেট, লজেন্স, বই, খাতা, পেন্সিল! সমরেশ তেমনি ছুটোছুটি করছে দোকানে, ছেলেমেয়েরা তেমনি হৈ-চৈ করছে, আব্দার করছে সমরেশদার কাছে। ফাউ চাইচে। ছোট্ট দোকানটি আজও ঠিক সেদিনের মতন হাস্যোজ্জ্বল। আজো তেমনি ভীড়।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে নন্দিতা অনেকক্ষণ তাই দেখল।

চলে যেতে পারল না, দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ চীৎকার কে যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে!

অপরিচিত মেয়েকে দেখে ওরা যেন মূক, বধির।

সমরেশ ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখল, নিয়মিতভাবে জিজ্ঞেস করল—"কি চাই!" নন্দিতা হেসে ফেল্লে, বল্লে, "এত সহজে মানুষকে ভুলে যেতে

হয় সমরেশবাবু!” সমরেশ এবার চিনতে পারল, বললে—“আরে আপনি? কবে এলেন? আমি ত ভাবতেও পারিনি যে আপনি আসবেন। আপনি চলে গেলেন অর্থাভাবে, অথচ কতরকম কথাই না উঠল আপনার নামে! সত্যি!”......

নন্দিতা হাসতে থাকে। বলে, “কি রকম?”......

সমরেশ লজ্জায় রাঙা হয়ে ফিক্ করে একটু হেসে বুঝিয়ে দিলে যত সব অশ্লীল এবং বাজে কথা, যা মুখে আনা যায়না—তা!

নন্দিতা চাপ দিল না, জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন?

সমরেশ এইবার কথা বললে, ও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, মুখখানা হঠাৎ, দোকানদারি কায়দায় কুঞ্চিত করে, গলা ভারী করে বল্লে, কি আর বলব বলুন, এত বছরের মধ্যে আপনাদের সময়টাই ছিল সব চাইতে ভাল। আপনারাও গেছেন, আর বিশ্ববিত্যালয়ও অন্ধকার হয়েছে! আপনারা ছিলেন প্রাণ! আজকাল সব প্রাণহীন গতানুগতিক জীব, আধমরা!

একথা নতুন নয়, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সর্বদাই একথা সমরেশ বলে, দোকানদারী বুদ্ধি!

ক্রেতারা এতক্ষণ নির্বাক চেয়েছিল ওদের দিকে, কথাবার্তা শুনছিল।

এতক্ষণে বুঝতে পারল আগতা একজন প্রাক্তন ছাত্রী, অনেকদিন পর এসেছিলেন!

একে একে সবাই সরে পড়ল। ছেলেমেয়েরা আব্দার থামালে, বুঝলে আপাততঃ হাজার আব্দারেও সমরেশদার মন গলবে না, চেঁচামেচি না করাই ভাল।

নন্দিতা দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসল, সমরেশ লেমনেডের বোতল খুলে দিল। সমরেশ যে খবরের ডিপো, একথা ও জানে, কিন্তু খবর আদায় করবার জন্তে বসতেই হবে।

নানান্ রকম কথা, খবর, মন্তব্য মুখে মুখে দৌড়োদৌড়ি করল, কিন্তু যে খবর জানবার ওর আকুল আগ্রহ তা নন্দিতা কিছুতেই মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারল না। সমরেশ সুকৌশলে প্রেমাঙ্কুরের খবর এড়িয়ে গেল। বাসন্তীর বিয়ের খবর দিল, আন্নাকালি অত্যধিক মোটা হয়েছে, তাও বলল, কণিকার চলে যাবার খবর দিল, আর দিল রতিনের খবর,

কো-অপারেটিভ ষ্টোরের খবর দিল, সায়েন্স ল্যাবের জন্যে কোন মহারাজা কত হাজার টাকা দান করেছে তাও বলল; বললনা শুধু প্রেমাঙ্কুরের কথা আর ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীর কথা।

অগত্যা নন্দিতা সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, অন্যান্য পাঁচ কথার মধ্যে নির্লিপ্ততার অভিনয় করে, ডক্টর প্রশান্ত চৌধুরী কেমন আছেন?

দীর্ঘনিশ্বাসে আভাস দিয়ে সমরেশ বললে, "ভাল না, কাজকর্ম বন্ধ।" দুর্ঘটনার কথা বলে, বল্লে "আজকাল দেখতে পান না, অন্ধ হয়ে গেছেন! তারপর আবার গভীর নিস্তব্ধতা।

একখানা অঙ্কের বই তুলে নিয়ে নন্দিতা পাতা উল্টোতে লাগল আর সমরেশ হিসেবের জাব্দা খাতায় মনোনিবেশ করল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর নন্দিতা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, ম্লান হেসে বললে, "আজ আসি।"

সমরেশও হাসল ম্লান হাসি, বললে, "আচ্ছা, নমস্কার!"

মন্থর গতিতে নন্দিতা এগিয়ে চলল। পা দুটো যেন হঠাৎ ভারী হয়ে উঠেছে। রাস্তা যেন আর ফুরোতে চায় না, অন্ধকার যেন বাড়তে থাকে। বেলা তখন ছ'টা।

প্রেমাঙ্কুরের খবর পেল পথে আন্নাকালির কাছে। সেই সবিস্তারে এবং প্রথমেই, এমন কি কুশল প্রশ্ন করার আগেই জানিয়ে দিল, প্রেমাঙ্কুর বিয়ে করেছে, এখানকারই অপরূপ সুন্দরী এক ছাত্রীকে। এখন সে এখানেই চাকরী করে। দক্ষিণ ধারের বাংলোগুলির মধ্যে একটাতে তার বাড়ী। সম্প্রতি কলকাতা গেছে, স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, কলকাতায় বড় ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়া তিনি কিছু করতে ভরসা পান না।

নন্দিতা খবর শুনে শুধু হাসল, কিছু বললে না। তার মনে পড়ে গেল, ছোট্ট আবীরের অনাবিল হাসি, তার টানাটানা চোখ দুটো, ধবধবে মুখখানা, তার আধো আধো ভাষা, কথাবার্তা।

আন্নাকালির পরের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে প্রায় ছুটেই পালাচ্ছিল, কি মনে করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আমার ছেলেটি ভাল আছে, সুন্দর হয়েছে ছেলেটি, যেন স্বর্গের দেবদূত!"

"ওমা, তাই নাকি, তা কোথায় গা বাছাকে রেখে এলে!"

হাসতে হাসতে বললে, "তার আপন লোকের কাছে।"

আন্নাকালি মুষড়ে পড়ল। নন্দিতাকে একলা দেখে ও ভেবেছিল ওর অনুসন্ধান কাজে লেগেছে, কাজেই নির্বিবাদে কিছু ঘুষ আদায় করবে, প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে। কিন্তু নন্দিতার অকপট কথা শুনে ও আশ্চর্য্য হয়ে গেল!

বললে, বলিহারী তোমার সাহস বাপু। "আমি হলে ত পারতাম না।"

"আচ্ছা।" বলে নন্দিতা ঘুরে দাঁড়াল এগিয়ে যাবার জন্যে।

* * * *

ডাঃ চৌধুরীর বাড়ী।

সেই পরিচিত বাংলো। সামনে বাগান, বাগানে মোরসুমি ফুলের গাছ, শিউলির ঝাড়, হাস্নুহেনার ঝাড়; মখমলের মতন নরম শ্যামল ঘাস, মাঝখান দিয়ে সরু লাল সুরকীর রাস্তা। সামনে বারাণ্ডা, টব দিয়ে ঘেরা, গাছগুলো ফুলের ভারে অবনত। গেটের ধারে সেই ব্রাসের নেমপ্লেট।

গেটের ধারে ক্ষণেকের জন্যে নন্দিতা থমকে দাঁড়াল। ভেতরে যাবার সাহস ওর নেই!

গিয়ে কি দেখবে?

অন্ধ ডাঃ চৌধুরীকে দেখবার মতন সাহস আজ ওর নেই। কি করে দাঁড়াবে, কি বলবে, পালানোর জবাবদিহী কি দেবে? হাজার দিনের হাজার প্রশ্ন আজ ওকে ছেঁকে ধরল চারিদিক থেকে; এমন সব প্রশ্ন যা কোনদিন ও কল্পনাও করতে পারিনি। জীবনে এতবড় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আজ এইখানে ওর প্রথম পরাজয়। হাতখানা সন্তর্পণে রাখল গেটের ওপর।

যাবে ভেতরে?

কি দরকার, ফিরে চলে গেলেইত হয়। ডাক্তার গুপ্তার খামখেয়ালী কথাবার্তার ভেতর, আবীরের হাস্যোজ্জ্বল বাড়ীতে!

কিন্তু পারল না ফিরে যেতে। কিসের আকর্ষণ?

বাড়ীটা অন্ধকার, কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। গেট্ খুলে ও ভেতরে ঢুকে গেল।

ওর মনে হল কে যেন ওর বুকের ভেতর হাতুড়ি পিট্‌ছে।

বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। এখনও ও ফিরে যেতে পারে। সামনেই ড্রইংরুম। পাশেই ডাঃ চৌধুরীর ষ্টাডী!

ওর মনে পড়ে গেল সেই পার্টির কথা। ডাঃ চৌধুরীর কথা— "মেয়েদের বেশী লেখাপড়া আমি পছন্দ করিনা।···জীবনে পদস্খলনের অফুরন্ত সুযোগ···"

মনে পড়ে গেল বনের মাঝখানে সেই ছোট্ট ষ্টেশনের কথা। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি, চায়ের ষ্টল্, দুখানা টিকিট, কণিকার কথা, রতিনের প্রেম নিবেদন।

ল্যাবরেটরি, লেকচার··

আরও কত কি!

তাঁর অনাবিল হাসি, তাঁর সাধনা-দীপ্ত দৃষ্টি, তাঁর অটুট মহান গাম্ভীর্য্য!

নতুন চাকর এসে প্রশ্ন করল "কাকে চাই?"

"ডক্টর চৌধুরী আছেন?"

"আছেন, দেখা হবে না!"

"ও"। নন্দিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! মনটা কিন্তু ওর অজান্তেই ফিরে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

চাকর ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করল "আপনার নাম?"

"নন্দিতা!"

"আচ্ছা দাঁড়ান!" বলে চাকরটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিকে নীল বাতি জ্বলছে। অর্দ্ধশায়িত ডক্টর চৌধুরী। সামনে টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা, অ্যাস্‌ট্রেতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগার, থেকে থেকে তার থেকে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

পদশব্দ শুনে মুখটা তুলে বললেন "বস নন্দিতা!"

ধ্যান ভগ্ন মহাযোগী। এক মুহূর্ত আগে যে বিরাট গাম্ভীর্য্য সমস্ত ঘরময় বিরাজ করছিল, ঐ দুটি কথায় তা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল!

ভয়ে ভয়ে নন্দিতা চেয়ারটাতে বসে পড়ল! ও নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলছে সন্তর্পণে, পাছে ডাঃ চৌধুরী শুনতে পান!

এক মিনিট, দু'মিনিট, পাঁচ মিনিট।

"কেমন আছ ?"

"ভাল !"

ছোট্ট প্রশ্ন, তদপেক্ষা ছোট উত্তর। আবার নিস্তব্ধতা। ঘড়িটা ছুটে চলেছে টিক্ টিক্ টিক্,...

সামনে ডান দিকের কোণ ঘেঁষে কর্ণার ল্যাম্পের তলায় রূপোর ফ্রেমে বাঁধান ছবি।

হাস্য-মুখরা কণিকা।

ঘরময় আবার সেই কঠিন নীরবতা !

নন্দিতার অসহ্য হয়ে উঠল। কিছু বলবে সে, যা হক কিছু একটা; যে মহামানবের আদর্শ অত্যন্ত সঙ্গোপনে ওকে উৎসাহিত করেছে, সেই মহাপুরুষের সামনে আজ ও কিছু বলবে।

এই পাঁচ বছরকার জ্বলন্ত ইতিহাস।

ও জানাবে যে ও পরাজিত হয়নি। ডক্টর চৌধুরীর নীরব সাধনা ও নিজের জীবনে পরিপূর্ণ করেছে।

দুজনেরই অজান্তে ডাঃ চৌধুরীর জীবনের সে শিক্ষা ও নিজের জীবনে মেনে নিয়েছে, নিয়ে জীবনকে জয় করেছে, তার জন্যে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ! তাই আজ ভাষা চাই !

সময় ছুটে চলেছে।

"আপনার দুর্ঘটনার কথা শুনলাম !" নন্দিতা বললে।

হাসির সামান্য একটা রেখা ডাঃ চৌধুরীর ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনের টেবিলের ওপরটা হাতড়াতে হাতড়াতে উনি বললেন, "কোনটা ?"

নন্দিতা চেয়ার থেকে উঠেছিল মাত্র, সিগারটা এগিয়ে দেবার জন্যে। উত্তর শুনে বসে পড়ল।

কি বলবে, ভাষা খুঁজে পেলনা।

আবার নীরবতা।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডক্টর চৌধুরী বললেন, "জান বোধ হয় কণিকা চলে গেছে !"

অস্পষ্ট নন্দিতা বল্লে "শুনেছি !"

সিগারের ধোঁয়া থেমে থেমে ওপরে উঠছে, গোল গোল হয়ে।

নন্দিতার কণ্ঠস্বর আজ নিস্তব্ধ !

কেন ?

জীবনকে নিয়ে যে পুতুলের মতন ছিনিমিনি খেলে, তার আজ কিসের ভয় ? কেন এই অকারণ লজ্জা, দ্বিধা, ভয়, শঙ্কা ?

আজ কেন সে অমন করে চুপ করে বসে আছে ? কেন ? কেন ? কেন ?

ডক্টর চৌধুরী বলতে আরম্ভ করেন, "কণিকা ছেলেমানুষের মতন ভুল করেছে, নিজেকে পুড়িয়েছে। অবলা নারী বুঝল না, যে, পুরুষের জীবনে কর্মের কোলাহলই হল চরম সত্য।"

থেমে যান হঠাৎ, কি ভাবেন এক মুহূর্ত, তারপর বলেন, "নারীর জীবনে পুরুষ শুধু আয়োজন, সে আমার সাধনাকে হিংসে করত! অভিমান করে ও আমায় জানায়নি ওর-জীবনের অভাব। আঘাত দিয়েছিল আমার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে, নিজেকে ও তাই হারাল, আমাকে ও হারায়নি।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আর একটা দিন অপেক্ষা করলে ও দেখতে পেত আমার সাধনার প্রতি ওর অভিশাপ কতটা কার্য্যকরী হয়েছে!

নন্দিতা চুপ করে বসেছিল। শুনছিল কথাগুলো, মন ওর ছুটে গেছে কণিকার উদ্দেশে।

অভিমানিনী বুঝতে পারেনি ভালবাসা কি প্রবল স্রোতস্বিনী পাষাণের বুকের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে!

অহঙ্কারে আঘাত দিয়ে ও মানুষ যাচাই করতে গিয়েছিল তাই নারীত্বে আঘাত পেয়ে ফিরে গেছে।

ডক্টর চৌধুরীই আবহাওয়াটা লঘু করবার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার কথা ত' কিছু বললেনা! কেমন আছ, কোথায় আছ?"

নন্দিতা ভীরু, আবছায়া নিজের কথা ও বললে। ডক্টর গুপ্তর কথা ও বললে।

আবার সব চুপ চাপ।

"তোমার বিষয় অনেক রকম কথা শুনেছি কিন্তু কোনটা বিশ্বাস করিনি!"

নন্দিতা উত্তর দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপরে বললে, "শুনেছেন বোধ হয় আমার একটি ছেলে আছে।"

"শুনেছি, প্রেমাঙ্কুর বলছিল"

নন্দিতা নীরবে হাসল শুধু, কিছু বললে না।

"তুমি কি আজই ফিরবে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ছেলেকে আনলেনা কেন ? দেখতাম, কেমন দেখতে হয়েছে ?"

নন্দিতা ভাবল বলে, 'আপনার আদর্শে ?'

বল্লে, "ভাল !"

"বস !" বলে ডক্টর চৌধুরী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, সন্তর্পণে অনুভব করতে করতে। নন্দিতার ইচ্ছে হল পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে !

মিনিট পনের পরে ডাঃ চৌধুরী ফিরে এলেন, হাতে তাঁর ছোট্ট একটা বাক্স। নন্দিতার হাতের দিকে সেটা আন্দাজে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এটা তাকে দিও।"

অহেতুক কৌতূহল নন্দিতার চোখে ফুটে উঠল। তার ছেলেকে দিলেন ডাঃ চৌধুরী ! দান নয়, আশীর্ব্বাদ।

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "কয়েকটা সামান্য খেলনা। যার জন্যে এনেছিলাম সে নিতে পারেনি। জ্ঞান হবার আগেই সে চলে যায়—" নির্লিপ্ত ভাবেই উনি বলে চলেন, "আমার মেয়ের, সে অনেকদিন আগেকার কথা ! তুলে রেখেছিলাম, আশা করেছিলাম অনেক, কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি ; তোমার ছেলেকে দিও, অনেকখানি সান্ত্বনা পাব !"

'এই বিশালতার পেছনে এতবড় একটা শূন্যতা আছে তা কে জানত !'

নন্দিতা এতদিন দেখছে কিন্তু কোনদিনও এ দুর্বলতার সন্ধান পায়নি ! বিরাট হিমাদ্রির চিরজননের মৌনতার অন্তরালে সঙ্গোপনে গুপ্ত থাকে অনুরূপ শূন্যতা, যার আভাষ পাওয়া যায় না, অনুভব করা যায় !

ডক্টর চৌধুরী বললেন, "নন্দিতা তোমার ছেলেকে দেখবার ইচ্ছে রইল, আর আমার হয়ে তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র। তার জন্ম মহান

হয়ে উঠেছে যে আত্মত্যাগ ও সাধনায়, তার পূর্ণ মর্য্যাদা যেন সে দিতে পারে !”

বাইরে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোক ; ঘরের ফিকে নীল রংয়ের আলোর সঙ্গে চলেছে তার রূপাভিসার জানলার ধারে। সুদূর দিগন্তে কত শত তারা ভাড় করে আছে। পৃথিবীর বুকে নিস্তব্ধতার অভিযান ; মাঝে মাঝে অনেক দূরে কাঁদছে নিদ্‌হারা পাখী, “বৌ কথা কও !” “বৌ কথা কও !”……

তারই বিলাপের রেশ ভেসে আসছে ওদের দুজনের মাঝখানে। বাইরের মহাশূন্যতার সঙ্গে বিশাল মহাপুরুষের নিস্তব্ধতা যেন এক সুরে বাঁধা। ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী আর রহস্য ঘেরা অনন্তকালের মহা ভৈরব !

ধ্যান মগ্ন মহাশান্তি !

নন্দিতা ভয় পেল তার নিস্তব্ধতাকে আঘাত করতে।

সন্তর্পণে বললে, “আসি !”

চমকে উঠে পেছন ফিরলেন ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী, “ও হ্যাঁ, আচ্ছা !”

ভীরু পদক্ষেপে নন্দিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কিসের আকর্ষণ ওর গতি রোধ করল।

শেষ বারের মতন পেছন ফিরে তাকাল'।

দেখল দু'ফোঁটা জল নেমে আসছে ধীরে ধীরে ওঁর গাল দুটি বেয়ে।

ফিরে গেল নন্দিতা, প্রণাম করা হয়নি।

ধীরে ধীরে ওঁর পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে দিল।

ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরী এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি। পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন।

ওঁর দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল নন্দিতার মাথার ওপর।

নন্দিতার দু'ফোঁটা জল পড়ল ওঁর পায়ে।

অস্পষ্ট বললেন, “চিরজয়ী হও !”

নন্দিতা যেন প্রাণহীন, অসাড়, উঠবার ক্ষমতা নেই। ও পা দুটি যেন ওর চিরকালের আরাধনা, কিছুতেই ছাড়তে মন চাইল না।

ধীরে ধীরে উঠে নন্দিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল জীবনের পরাজয়ের অশ্রুলিখা !

বাইরের নিঝুম প্রকৃতি। সুপ্তির কোলে ঘুমন্ত শিশুর মতন শান্ত পৃথিবী।

ওপরে সজাগ তারা, সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষে। ওর সমস্ত দেহে স্নেহের পরশ দিচ্ছে চন্দ্রালোক।

দূরে তখন কাঁদছে ঘুমভাঙা পাখী।

আজ অনন্ত আকাশ তলে, প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে প্রথম ও নিজের কাছে হার মানল।

নন্দিতা ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীকে ভালবাসে।

তবু ইউনিভারসিটি টাউন ওকে ছেড়ে যেতে হবে।

একটা টানা দীর্ঘ নিশ্বাস ওর সমস্ত সত্তাকে মন্থন করে বেরিয়ে এল'— ঘুমভাঙা পাখী আবার কেঁদে উঠল কাছেই।

"বৌ কথা কও!" "বৌ কথা কও!"…কথা কও!…

৮

আবীর ছেলেটি ভয়ানক দুরন্ত, এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে নন্দিতা ওর নাম রেখেছে "শান্ত।"

'শান্ত' যে 'প্রশান্ত'কে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আপন করে একথাটা স্বীকার করতেও ওর কুণ্ঠা।

শান্তর পৃথিবী খুব ছোট। বাড়ীর ভেতরে তার আরম্ভ। বাগানের পাঁচিলে তার শেষ। এর ভেতর যা কিছু সবই ওর কাছে রহস্য—গাছ পাথর, ফুল, এমনকি প্রকাণ্ড ঝাউগাছটা পর্যন্ত। প্রথম প্রথম সব কিচ্ছুকে ও জুজু বলে ভয় পায়, তারপর ধীরে ধীরে স্বাদে ও তাদের চিনতে শেখে, সবই যেন ওর খাদ্য!…

বাড়ীতে সবাই ওকে ভালবাসে, সব চাইতে বেশী ভালবাসে বাড়ীর বুড়ো চাকর রামশরণ। দাদুকে ও কাঁধে করে সমস্ত বাড়ীময় ছুটোছুটি করে, বাগানে নানান রকম ফলমূল দেয়, আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজ করে, ওকে গিনিপিগের দলের মধ্যে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে ডাঃ গুপ্ত চীৎকার ক'রে রামশরণকে সর্বসমক্ষে গর্দ্দভ প্রতিপন্ন করেন, রামশরণ হাসে, শান্তর মনে শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

শান্ত রামশরণের নামকরণ করেছে রানন্! রামশরণ তাইতেই খুসী হয়ে ওকে একটা ছোট্ট খরগোস উপহার দিয়েছে। ঐ খরগোস এখন ওর খেলার সাথী!

রামশরণ যদি ভাল হয়, তাহলে তার চেয়ে অনেক ভাল 'মামি'। সরমার নাম ও দিয়েছে 'মামি', মাসি বলার ব্যর্থ প্রয়াস! মামি ভাল হবেনা কেন। মামি ওকে খাইয়ে দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দেয়, চকোলেট দেয়, লাল জামা পরিয়ে দেয়, ভাল ভাল খেলনা দেয়, বকেনা, কতরকম গল্প বলে। মামির সবচেয়ে ভাল কাজ হল ওর প্রত্যেক কথার স্পষ্ট জবাব দেয়।

কিন্তু যাকে ও সবচাইতে ভয় করে সে হল 'বুলো' ওরফে ডাঃ গুপ্ত নিজে।

তিনি ওর মতে মূর্তিমান জুজু। মাথার সাদা চুল; আর মাইক্রোস্কোপের ছাপ লাগা আধ বোজা চোখ—ও ভয়ানক ভয় পায়। যদিও বুলো ওকে ভালবাসে, আদর করে কিন্তু শান্ত কিছুতেই বোঝে না। এ্যাসিডে পোড়া হাতগুলো দিয়ে যখন উনি ওর হাতখানা ধরবার জন্মে এগিয়ে আসেন, ও ভয় পেয়ে সরে যায় দূরে, বলে জু, জু,—তুম জুজু……

বুলোর সবচাইতে ভয়াবহ জিনিষ হল ময়লা এ্যাপ্রনটি। ঐ যে এ্যাসিড পোড়া, আর রক্তমাখান এ্যাপ্রন, ওটাই হল সবচেয়ে বীভৎস।

বুলোকে ভয় করবার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা হল ওঁর অনাবশ্যক আতঙ্কজনক ভীষণ চীৎকার! তাঁর চীৎকার শুনে শান্ত সব সময়ে ভয় পেতনা, মাঝে মাঝে ওর রাগও হত!—শান্তর মনের একটা ধারণা বাগানের যা কিছু সব ওর নিজের; অথচ এমনই বিপদ, মাঝে মাঝে বুলোর অনাবশ্যক চীৎকার যেন ঘূর্ণী উঠত। রামশরণ ওকে বাগানের কোণে নিয়ে হয়ত গিনিপিগদের সঙ্গে খেলা করছে, এমন সময় উঠল ঐ বুলোর চীৎকার। ব্যস, অমনি রামশরণ ওকে কোলে তুলে ছুটত ঘরের দিকে, মামি হয়ত' মুখে আঙ্গুল দিয়ে বলত' "স্—চেঁচিও না বুলো রাগ কর্ব্বে!

এমনি করে গিনিপিগদের ফেলে আসা। বুলোরই যেন সব, ওর কিছু নয়!

এইতে রাগ আরও বাড়ত!

কিন্তু তবু বুলোকে ও ভালবাসত, বুলোর জন্যে ওর মনে আছে অনেকখানি স্নেহ!

বুলো যখনই পেছনদিকে হাত রেখে, সামান্য কুঁজো হ'য়ে বিড়্ বিড়্ করে আপন মনে বক্ বক্ করতে করতে বাগানে পায়চারি করত, শান্ত তখন সবাইকে শান্ত করে বেড়াত। কেউ কথা বললেই, ঠোঁটের বদলে নাকের ওপর আঙ্গুল রেখে মামির মতন চোখ দুটো বড় করে বলত' "সি—কটা কোব্বে না, বুলো লাগ্ কোব্বে!"

তারপর হয়ত বুলোর পেছনে পেছনে বুলোরই অনুকরণে ও হাঁটত', অবশ্য বুলোর সামনে নয়!

রামশরণ যদি সেই সময় কিছু বলতে আসত তাহলে বুলোর অনুকরণে একটা চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে বলত 'গদ্দব!'

বুলোকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করবার কারণও আছে। বুলো যেভাবে নির্ভয়ে পিনিগুলোকে নাড়াচাড়া করে তা ওর ঈর্ষার বিষয়। ও পিনি-গুলোকে ভয়ানক ভয় পায়। রামশরণ কাছে না থাকলে ওদের ধার কাছ দিয়ে ও ঘেঁষে না, অথচ বুলো স্বচ্ছন্দে, আর নির্ভয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করে।

ওর মনে ভয়ানক আকাঙ্ক্ষা, বড় হলে ও ও বুলোর মতন হবে। মাঝে মাঝে ওর সত্যি ভয়ানক রাগ হয় বুলোর উপর। ওর চোখ দুটো যদি ওরকম না হত, আর চীৎকার যদি না করত, তাইলেই ত সব হয়, অথচ……

বুলো যদি হয় জুজু তাহলে ল্যপকথার লাজকন্যা হল মানি! অথচ এমনই আশ্চর্য্য মানির সঙ্গেই ওর দেখা হয় সব চাইতে কম।

দিনান্তে দুবার মানিকে ও পেত' একান্ত আপন করে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই, আর রাত্রে শোবার সময়। তাছাড়া অন্যসময় দেখা হয় মুহূর্তের জন্যে। মানির সমস্তদিন কাজ, কাজ, কাজ!

মানির হাত দুটোর প্রতি ওর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ঐ হাতদুটো ধরে ও নির্ভয়ে বাগান পেরিয়ে পাঁচিলের ওধারে পাইন বনে যেতে পারে, একটুও ভয় করে না। এমন কি সন্ধ্যার অন্ধকারে পাইন গাছের ওপর-দিকে যেখানে সচরাচর জুজুরা আড্ডা বসায়, সেদিকে চাইতেও ওর ভয় করে না!

মানি যেন ওর মামির কাছে শোনা রূপকথার রাজকন্যা—ঠিক তেমনি সুন্দর, তেমনি ভাল'।

রূপকথার রাজকন্যাদের শান্ত যেমন ভালবাসে, ডাইনির দেশে রাজকন্যা যখন গিয়ে পড়ে তখন যেমন সচকিত হয়ে মামিকে ও প্রশ্ন করে বসে; লাজপুতুল আসবে না মামি!—মানির জন্যেও ঠিক তেমনি ভাবে ও সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় ও হবে লাজপুত্তুর, মানি যদি ডাইনির দেশে যায় তাহলে ও মানিকে বাঁচাবে, ঠিক লাজপুত্তুরের মতন! মানিকে আরও বেশী ভালবাসে, তার কারণ মানি ওকে কত ভাল ভাল কথা বলে, গল্প বলে, পাইন বনের ধারে বসে! মানি ওকে শেখায় কেমন করে চুপ করে বসে প্রজাপতির কাজ দেখতে হয়! ওকে বলে দেয় কেন বুলো যখন পায়চারি করে তখন গোলমাল করতে নেই। মানি ওকে শেখায় জুজু বলে কিছু নেই, ভয় পেলে লোকে খারাপ বলে, পড়ে গেলে কাঁদতে নেহ, যারা কাঁদে মানি তাদের একটুও ভালবাসে না!

ওর কল্পনার ইন্দ্রপুরী হ'ল কোণের ছোট্ট ঘরটা, যেখানে মানি সারাদিন কাজ করে। মানি ও ঘরে কিছুতেই ওকে যেতে দেয় না, ওটা নাকি পিনিদের স্বর্গ!

মাঝে মাঝে খেলা ছেড়ে ও পালিয়ে আসে, কিছু ভাল লাগে না, মানির ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে ঢুকবার সাহস থাকে না! এমন অনেকদিন হয়েছে নন্দিতা কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেছে শান্ত দরজার পাশটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে!

এই ঘরটার প্রতি ওর অহেতুক কৌতূহল। মাঝে মাঝে হয়ত একদিন কিছুক্ষণের জন্যে ও ঐ ঘরে প্রবেশাধিকার পায়, সেদিন ওর আনন্দ সবচাইতে বেশী; চুপ করে···বসে থাকে, মানির কাজ নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করে। ওর কি রকম আশ্চর্য্য লাগে! মানি কি করে?

এ প্রশ্নের উত্তর ওর ছোটমাথায় কিছুতেই আসে না। ওর সব চাইতে আশ্চর্য্য লাগে পিনিদের যখন দেখে, টেবিলের ওপর চুপ করে শুয়ে থাকতে!

মানি ওর চোখে আরও কত বড় হয়ে ওঠে।

সেদিন সকালবেলা, ছোট্ট সাদা ধবধবে ওভারলটি প'রে, দুধ খেয়ে, হাতে একটি লাঠি আর সঙ্গে খরগোস নিয়ে শান্ত গেল বাগানে খেলা করতে! কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে, কিছুক্ষণ ধূলো বালি নিয়ে খেলা করে কি মনে করে গেল পিনিদের বাড়ীর দিকে। বোধ হয় ভয় হ'ল, দূরে দাঁড়িয়ে কি দেখল' তারপর ফিরে এসে বসল' শিশির ভেজা ঘাসের ওপর, একদৃষ্টে চেয়ে রইল' আধফোটা সূর্য্যমুখী ফুলটার দিকে!

বসে রইল বিজ্ঞের মতন, আইনষ্টাইন্ কি ঐ রমক একটা কিছু! নিজের ছোট্ট ল্যাবের জানালায় দাঁড়িয়ে নন্দিতা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছিল ওর গতিবিধি আপন মনে। ওর অমন ভাবে বসা দেখে তার হাসি পেল'।

থাকতে পারল না ঘরে, বেরিয়ে এল ঠিক ওর পাশটিতে। ওর ছোট্ট সোণালী চুলের ভারে নুইয়ে পড়া মাথার ওপর আস্তে হাত রেখে বললে, "কি হয়েছে শান্ত, অমন চুপচাপ বসে?" বিজ্ঞের মতন ঠোঁট উল্টে, ডান চোখের ওপর আঙ্ুল রেখে, বললে, "সি,—চেঁচিওনা! ফুলের মধ্যে কি আছে আমি তেকব!"

"কেন?" নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে!

"তকাল বেলা ফুলটা এতটুকু ছিল," হাত দিয়ে ইসারায় পরিমাণটা বোঝাতে বোঝাতে শান্ত বললে, "আর আপ্‌পি আপ্‌পি এত বল হয়ে গেল!"

"বিকেল বেলা আপনিই আবার বন্ধ হয়ে যাবে" নন্দিতা হাসতে হাসতে বললে।

উৎফুল্ল হয়ে আদো আদো ভাবায় ও জানিয়ে দিলে, তাহলে বিকেল পর্য্যন্ত ও ঐখানে বসে থাকবে!

নন্দিতা আদর করে, সস্নেহে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলে।

শান্তর দৃষ্টিতে আজ হঠাৎ ঝরে পড়ল প্রেমাঙ্কুরের উজ্জ্বল দৃষ্টি!

নন্দিতা একটি ছোট্ট চুমো খেয়ে বল্লে, "বড্ড রোদ্দ্ুর বাবা, এখন ঘরে যাও, বিকেলে এস!"

বুলোর মতন চোখদুটো কুঞ্চিত করে, হাতটা পেছন দিকে নিয়ে কুঁজো হয়ে বললে, "গদ্দব!"

নন্দিতা হাসতে হাসতে চলে গেল!

কিছুক্ষণ পরে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ গুপ্ত, হাতে তাঁর ওর খরগোস।

ওর চোখের সামনে সেটাকে বার দুই নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শান্ত অশান্ত হয়ে বলে উঠল—"এই বুলো, ছেলে দাও!" ওদিকে সূর্য্যমুখী যে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

ডাঃ গুপ্ত ওরফে বুলোর একটি মহৎ দোষ হল ওর পেছনে লাগা। বিকট হেসে বললেন, "আমি পিনিদের দিয়ে দেব এই খরগোস, ওরা খেয়ে ফেলবে এটাকে!

'না!' অভিমানে, রাগে ও ত্রাসে শান্ত মুখখানা লাল করে বলল, 'না না'—ইচ্ছে ছিল বলে 'ধেৎ তা বুঝি হয়?'—একটা অবিশ্বাসের ভাব ওর মুখে চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভয়ও যে হয়নি তা নয়, বুলো যে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে এরকম একটা ধারণা ওর মনে অনেকদিনই আছে।

আর তাছাড়া রামশরণের দান এই খরগোসটা ওর অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ, এটাকে হারাবার ব্যথা বুলোর কথায় কল্পনাতেও অনেকবার দেখবার চেষ্টা করেছে, যতবারই ভাবে, কান্না ওর কণ্ঠ রোধ করে।

পিনিদের বাড়ীর দিকে যাবার অভিনয় করে বুলো বললে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়!"

অতিকষ্টে কান্না রোধ করেছে শান্ত। গাল দুটো টকটকে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো ক্রমেই ঝাপ্সা হয়ে আসে, কোন রকমে চীৎকার করে কেঁদে ওঠার লোভ সম্বরণ করে ও একরকম প্রায় ছোটখাট একটা মল্লযুদ্ধ করে খরগোসটা কেড়ে নিয়ে একছুটে অন্তর্হিত হয়ে গেল!

পথে রান্নু ওর পথরোধ করলে, হাসতে হাসতে বল্লে, "কি হয়েছে দাদু!"

দাদু উত্তর দিলনা, অদ্ভুত একটা শব্দ করতে করতে ছুটে গেল! সোজা গিয়ে দাঁড়াল মানির ঘরের দরজায়, এবং কোনদিন যা করেনা আজ তাই ও করে বসল।

দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ওর মনের ধারণা, বুলোর কাজের প্রতিকার মানি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

ঘরের ভেতর ঢুকে ও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। এখান থেকে কেউ কিছু করে এমন ভয় ওর নেই।

নন্দিতা হাসতে হাসতে বললে, শান্ত, বস' ঐ কোণের টুলটার ওপর। একটু আগে যে কুরুক্ষেত্র পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে সে কথাই ও ভুলে গেল, ওর কল্পনার ইন্দ্রপুরীর ও আজ একজন বাসিন্দা, সামনে কত কি ঘটে যাচ্ছে, রহস্যভরা সব, একদিকে আগুন জ্বলছে, একদিকে টগ্ বগ্ করে শব্দ হয়ে লাল ধোঁয়া বেরুচ্ছে, একদিকে একটা পেটমোটা বোতল আগুনে গরম হচ্ছে আর তার পেট থেকে ভক্ ভক্ ভক্ করে বের হচ্ছে লাল ধোঁয়া! টেবিলের ওপর তিনটে পিনি ঘুমোচ্ছে! মানি পুতুলের মতন কাজ করে যাচ্ছে। কত রকম কি করছে।

সবই যেন ওর কাছে রূপকথার মতন আশ্চর্য্য!

শান্তর চোখ দুটো যেন রহস্যের আলোতে ঝক্মক্ করছে। কিন্তু বুলোর কথা ও ভোলেনি, যেমন করেই হক মানির কানে কথাটা তুলতে হবে।

ভয়ে ভয়ে বললে, "মানি, বুলো ভয়ানক দুষ্টু!"

'না,' কাজ করতে করতে মানি বললে 'বুলো খুব চালাক, ওর মতন ভাল লোক আর নেই।'

শান্ত একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। অভিযোগ কিন্তু এখনও জানান' হয়নি, তাই বললে, "ভয়ানক রাগ করে!"

মানি তেমনি ভাবেই উত্তর দিলে, "বুলো, বুলো কিনা তাই! বেশী কাজ করলে আর কম ঘুমোলে ওরকম হয়ে যায়!"

শান্ত ভীত হ'ল। মানিও ত তাহলে বুলোর মতন হয়ে যাবে। মানিও ত সমস্ত দিনরাত কাজ করে, আর ঘুমুতে ত' ও কোনদিন দেখেই নি। ভয়ে ভয়ে বললে, "তুমিও ত বেশী কাজ কর আর একদম ঘুমোও না—তুমি কিন্তু বুলো হবে না!"

না থেমেই শান্ত বলে চলে, "তুমি কি কাজ এত কর? ভাবটা এই যে কি এমন কাজ যা না করলেই নয়। বুলোর মতন হওয়ার চেয়ে কাজ না করাই ভাল।"

"এখন বুঝবে না, বড় হলে বুঝবে!" মানি বলে।

বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে শান্ত বলে, "আমি সব বুঝতে পারি!"

একান্ত মনোযোগ সহকারে বুলোর মতন একচোখ বন্ধ করে মানি কি দেখছিল, কিন্তু ওর কথায় হেসে ফেল্লে, ওর এত বড় একটা কথাকে মানি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলে না, বললে, "তাহলে শোন, আমরা একটা ওষুধ তৈরী করছি!"

"কি ওষুধ মানি?"

"এমন একটা ওষুধ যা খেলে কেউ বুলো হবে না!"

"তাহলে করছ না কেন?" শান্ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছে। যাক্, মানি তাহলে না ঘুমুলেও বুলোর মতন হবে না! ওষুধটা মানিকে খাওয়াতে পারলেই ও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে!

মানি বলে চলে, "সেটা কি অত সহজে হয় বাপি! বুলো আজ পনেরো বছর, সেটা তৈরী করতে চেষ্টা করছে," বলে আঙুল দিয়ে সঙ্কেত করে বোঝাতে চাইল পনেরো বছর কতগুলো!

অধৈর্য্য হয়ে শান্ত বললে, "আর কতদিন লাগবে?"

মানি উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বললে, "আর বেশী দিন নয়।"

শান্ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। বললে, "তুমি খেও ওষুধটা, বুলোকে কিন্তু দিওনা!"

তারপর মনে মনে হিসেব করে দেখছে মামিকে আর রানন্‌কেও দেওয়া যায় কিনা, কোলের ওপর খরগোসটা নড়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে শান্ত বলে উঠল, "আর খলগোসটাও খাবে!"

মানি হাসতে হাসতে বল্লে, "আচ্ছা!"

বলে আবার মানি কাজে মন দিল। শান্ত আর কোন কথা বললে না, অবাক হয়ে মানির কার্য্যকলাপ দেখতে লাগল।

মানি কাজ করে চলেছে ঃ কাজ ঃ কাজ ঃ কাজ ঃ

এমনি করে ডাঃ গুপ্তর জীবন কাটল'......

আরও হয়ত' ঐ একই ওষুধের পেছনে, কত লোকের জীবন কাটবে!

নন্দিতার মনে পড়ল প্রশান্তর কথা। তাঁরও জীবন কেটেছে কাজে।···

চেয়ে দেখল শান্ত টুলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে!···

সযত্নে শান্তকে ও তুলে নিল। আদরে আদরে ওকে রাঙা করে দেবে!

...জীবনের আরও একটা দিন কেটে গেল!

৯

তারপর পরিবর্ত্তনের ঝড় তুলে আরও তিন বছর কেটে গেছে। গবেষণায় কৃতকার্য্য হওয়ার আনন্দে ডাঃ গুপ্ত হার্টফেল করেন, সরমা মারা যায় ক্ষয় রোগে, যাবার সময় আবীরকে দিয়ে যায় তার সমস্ত সম্পত্তি, আর বলে যায়, "নন্দিতা জীবনে যে জন্যে নিজেকে হারিয়েছি তা ভাল কি খারাপ জানি না, তবে নিজের নারীত্বকে অপমান করেছি। মেয়েদের পূর্ণতা সন্তানের লালন পালনে, অর্থ পুরুষের সম্পত্তি! তুমি যথার্থ নারী, মাতৃত্বকে তুমি করেছ মহৎ, সুন্দর, আদর্শ; আশীর্ব্বাদ কর বোন, যেন জনমে জনমে তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই!"

ডাঃ গুপ্তের স্মৃতি-চিহ্ন আঁকা গবেষণাগার নন্দিতা ছাড়েনি, সেখানে আজও চলে ওর প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটনে গোপন অভিযান।

জীবনে ও সর্বতোভাবে জয়ী, কিন্তু শঙ্কা ওর যায়নি। আবীর যে লোক সমাজে জয়লাভ করবে তা কে বলতে পারে?

নন্দিতার জীবনের অভিযান সুরু হয় যখন, তখন বয়স ওর হয়েছিল অনেক, ছিল দুর্দ্দান্ত শক্তি, অসীম সাহস, অজস্র আত্মনির্ভরতা।

কিন্তু আবীরের সংগ্রাম আরম্ভ হবে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে। ও পিতৃ পরিচয় হীন!

আবীরের এই সংগ্রামই নন্দিতার জীবনের সব চাইতে বড় সংগ্রাম! কিন্তু অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেও নন্দিতা কোন সমাধান পেলে না! যে সমাজকে ও পদে পদে অবহেলা করেছে, আজ সেই সমাজের রক্তচক্ষু ওকে বিভ্রান্ত ক'রে তুললো!

এইবার হয় ত পরাজয়!

পরাজয়! পরাজয়! পরাজয়!

এই কথাটাই ওকে উন্মাদ করে তোলে। উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে নন্দিতা ছুটে চলে যায় পুরীতে। সভ্যতার দৃষ্টি এড়িয়েও এই সমস্যার সমাধান করবে।

* * * * *

সামনে রহস্যাবৃত সমুদ্র, তার অনন্ত গর্জন নিয়ে ছুটে চলেছে দিগন্তের পানে। কবে আরম্ভ হয়েছে এর এই অবিরাম ছুটে চলা, কোথায়, কবে হবে এর শেষ ?

ভোর বেলা সমুদ্র সৈকতে বসে এই কথাই নন্দিতা ভাবছিল। ভাবছিল, এই সমুদ্রের সঙ্গে ওর কতখানি মিল। এমনি করে ওও এমনি সম্পূর্ণ অজান্তে আরম্ভ করেছে ওর সগর্ব অভিযান। চাপা গর্জনে ও অনন্ত সংগ্রাম চালিয়েছে সমাজের বিরুদ্ধে, জীবনের বিরুদ্ধে, সভ্যতার বিরুদ্ধে।

আজও ওর সংগ্রাম শেষ হয় নি, কিন্তু অন্তরের ভাষার হয়েছে পরিবর্ত্তন। আজ ওর অন্তরের ভাষা 'সগর্ব' নয় 'ক্ষুব্ধ'।

সমুদ্রের ভাষার মধ্যেও যেন ও এই ভাষারই আভাষ পেল'। গর্জন নয়, আর্তনাদ।

শান্ত একটা রঙচঙে ফুটবল নিয়ে খেলা করতে করতে ওধারে ছুটে গেছে, নন্দিতার লক্ষ্য নেই সেদিকে।

নন্দিতা নিজের কথাই ভাবছে।

জীবনের অভিনীত ছোট ছোট ঘটনাগুলি একটির পর একটি পুনঃ অভিনীত হচ্ছে ওর কল্পনায়।

কল্পনায় ও দেখতে পাচ্ছে, ওর মার ফটো, ওর বাবার হাস্যমুখরিত চোখদুটি। আজ কোথায় তাঁরা ?

দেখতে পাচ্ছে বাসন্তীকে, আন্নাকালিকে, প্রেমাঙ্কুরকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক দিনটিকে।

দেখতে পাচ্ছে মহুয়া বনে ওদের পিকনিক, ওদের নৌকো করে ফেরা।
দেখতে পাচ্ছে কলকাতায় জন কোলাহল মুখরিত রাস্তা, নারী-কল্যাণ-সমিতি, সুন্দরী মোহিনী, ক্যান্ত, ডাঃ মিস্ গুপ্তা……

দেখতে পাচ্ছে দেরাদুনের গবেষণাগার, ছোট্ট আবীর, রামশরণ, আবীরের ছেলেবেলার হাসি···

আর দেখতে পাচ্ছে ডাঃ প্রশান্ত চৌধুরীকে, কণিকাকে, রতিনকে।

দেখতে পাচ্ছে ডাঃ চৌধুরীর কাছে বিদায় নেবার সেই সন্ধ্যাবেলা। অনুভব করছে তাঁর আশীর্ব্বাদ হয়ে ঝরে পড়া দুফোঁটা জল !

তার পর ?

সামনে ওর অন্ধকার!...

পরাজয়।...

শান্তর বলটা গিয়ে পড়ল, ঐ লোকটার পায়ের কাছে। অমন বিরাটাকৃতি লোকের কাছে গিয়ে বলটা নিয়ে আসার মতন সাহস ওর নেই অথচ অমন সুন্দর বলটা হারাতেও ওর ইচ্ছে নেই!

ভয়ে ভয়ে লোকটির কাছে গিয়ে বললে, "আমার বলটা!"

লোকটি ছিল ধ্যানমগ্ন, শুনতে পেল না।

আরও একটু জোরে বললে, "এই, আমার বলটা!"

লোকটার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। যে দিক থেকে শব্দ আসছিল, সেই দিকে ফিরে বললে, "কৈ তোমার বল!"

শান্ত বললে, "বা রে, ঐ ত!"

লোকটি চারপাশে অনুভব করেও যখন বলটা পেল না, তখন শান্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল!

অদ্ভুত লোকটা ত! ওর ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল ওঁর সঙ্গে ভাব করে! আস্তে আস্তে পাশে এসে বললে, "তুমি রূপকথার গল্প জান?"

ভাবটা এই, যদি জান, তাহলে আমায় বল! তারপর বললে, "তুমি বলটা নাও!"

ভাব করার ঘুষ ঐ রঙচঙে বলটা!

লোকটি হাসতে হাসতে বললে "এস, বলছি!"

শান্ত কাছে গিয়ে বসল। লোকটি বললে, "তোমার নাম কি?"

গম্ভীর ভাবে শান্ত উত্তর দিল, "শান্ত"।

লোকটি এক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে কি ভাবলে, তার পর বললে, তুমি কার সঙ্গে এসেছ?"

"মানি!"

"কোথায় তিনি?"

"ঐ দিকে" বলে সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে, আর ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত বললে। বললে, "ঐ যে!" আঙুলটা কিন্তু তখনও সমুদ্রের দিকে।

"তোমার নামটা ত বেশ!"

শান্ত বলে চলে, "মানি বলেছে এই নাম যাদের হয় তারা খুব ভাল হয়, বড় হয়, বুদ্ধি হয়, বুলোর মতন বুদ্ধি হয় "

"তোমার বুদ্ধি আছে ?"

খুব খানিকটা মাথা নেড়ে শান্ত বললে, "হ্যাঁ", তারপরেই কি মনে হল, বললে, "তুমি খুব ভাল !" তারপরে আবার বল্লে, "তুমি সাঁতার কাটতে পার ?"

লোকটিকে শান্তর খুব ভাল লেগেছে, আর সাঁতার যারা কাটতে পারে এই সমুদ্রে তারা ত ওর চক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান। লোকটি বললে, "হ্যাঁ, আগে পারতাম, আজকাল দেখতে পাইনা। দেখতে পাইনা কিনা, তাই পারি না।"

শান্ত উৎসুক হয়েছিল, পারার কথায় শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল, বললে, "আমি পারি না !" তারপর বললে, "কেন দেখতে পাওনা ?"

লোকটি বললে, "আমি অন্ধ কিনা, তাই !"

"কি অন্ধ ?"

উত্তর শুনবার অবকাশ ওর নেই, রূপকথার গল্প শোনা বাকী আছে, বললে, "কৈ, রূপকথার গল্প বললে না !"

লোকটি বলতে আরম্ভ করলে, "একটা দেশ ছিল, নাম ছিল তার সমুদ্রপুরী" তারপর বলে চলে, "সেখানে ছিল এক রাজা,—

"আর রাজপুত্তুর ?" স-উৎসাহে শান্ত প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, আর ছিল এক রাজপুত্তুর, খুব শান্ত......"

শান্ত হেসে উঠল খিল্ খিল্ করে, বল্লে, "তুমি আমার নাম বললে !"

এমনি করে ওদের গল্প এগিয়ে চলে।

লোকটি বলে চলে, শান্ত; খুব শান্ত হ'য়ে শোনে। নানান রকম প্রশ্ন করে। কত কথা......

* * * * *

নন্দিতা উঠে দাঁড়ায়। বেলা বাড়ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলে আশে পাশে কোথাও শান্ত নেই।

তাহলে কি...? নন্দিতা ঘেমে উঠল'

এদিক ওদিক কোনদিকে শান্তকে দেখতে পেলে না। দেখলে বেলা

অনেক হয়েছে, সমুদ্রসৈকত খালি, সবাই প্রাতঃভ্রমণ করে চলে গেছে, খালি দূরে একটা লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে নন্দিতা সেই দিকে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলল।

লোকটি হয় ত জানে।

বড় পাথরটার আড়াল থেকে নন্দিতা দেখলে সেই দৃশ্য, যা কল্পনায় বহুদিন, বহুরাত্র ও দেখেছে। কতবার কত রকম ভাবে এই দৃশ্য ও দেখেছে, তারপর ওর অজান্তে ওর কল্পনার দৃশ্য ওর নিজের চোখের জলে মিলিয়ে গেছে। আবার দেখেছে, আবার মিলিয়ে গেছে।

প্রশান্তর কোলে বসে শান্ত তখন নিবিষ্ট মনে গল্প শুনছে! আজও ঠিক তাই হল।

পাথরের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখতে লাগল সামনের ঐ দৃশ্য···

চোখের জলে আস্তে আস্তে আবার নতুন করে ঝাপ্সা হয়ে উঠল, কিন্তু······

কিন্তু মিলিয়ে গেল না।

সমুদ্রের শব্দে তখন আর্তনাদ নয়, পরম উল্লাস।

সমাপ্ত

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা